GBN S2 01

নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনা

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক

বাংলা (আধুনিক ভারতীয় ভাষা)

খণ্ড - ১

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

বিষয়-বিশেষজ্ঞ মণ্ডলী

ড° উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, প্রাক্তন প্রধান, বাংলা বিভাগ, গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়

ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, প্রধান, বাংলা বিভাগ, প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়

সমন্বয় রক্ষক ঃ ড° মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

লেখক মণ্ডলী

অধ্যায়	
১, ২	ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়
৩, ৪, ৮	সুরজিৎ সাহা প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়
৫, ৬	ড° প্রশান্ত চক্রবর্তী কটন মহাবিদ্যালয়
৭	শ্রী অভিজিৎ চক্রবর্তী টংলা মহাবিদ্যালয়

সম্পাদনা ঃ

বিষয়বস্তু ও ভাষা-সম্পাদনা ঃ ড° জ্যোতির্ময় সেনগুপ্ত, প্রাগজ্যোতিষ মহাবিদ্যালয়

গ্রন্থনবিষয়ে সম্পাদনা ঃ ড° মৃণাল জ্যোতি গোস্বামী, কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

প্রথম প্রকাশ ঃ জানুৱারী, ২০১৮

This Self Learning Material (SLM) of the Krishna Kanta Handiqui State Open University is made available under a Creative Commons Attribution-Non Commercial-Share Alike 4.0 License (international): http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

কৃষ্ণকান্ত সন্দিকৈ রাজ্যিক মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে পঞ্জীয়কের দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

মুখ্য কার্যালয় ঃ পাটগাঁও, রানী গেট, গুয়াহাটি - ৭৮১ ০১৭; Web : www.kkhsou.in
মহানগর-দপ্তর ঃ হাউসফেড কমপ্লেক্স, দিশপুর, গুয়াহাটি - ৭৮১ ০০৬

এই শিক্ষণসামগ্রী প্রস্তুতের ক্ষেত্রে আর্থিক সাহায্য প্রদানের জন্য নতুন দিল্লির 'দূর-শিক্ষা-পরিষদ'-এর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় কৃতজ্ঞ।

বিষয়সূচি

পৃষ্ঠা নং

অধ্যায় ১ ঃ **কবিতা — ১** ৭-১৯

নবদ্বীপ — বৃন্দাবন দাস ঃ কবি-পরিচয়, সারসংক্ষেপ, কবিতার বিশ্লেষণ, শব্দার্থ; সমুদ্রের প্রতি — মাইকেল মধুসূদন দত্ত ঃ কবি-পরিচয়, সারসংক্ষেপ, কবিতার বিশ্লেষণ, শব্দার্থ

অধ্যায় ২ ঃ **কবিতা — ২** ২০-৩২

রুপাই — জসিমউদ্‌দীন ঃ কবি-পরিচয়, সারসংক্ষেপ, কবিতার বিশ্লেষণ, শব্দার্থ; পুরনো কাগজের ফিরিওলা — প্রেমেন্দ্র মিত্র ঃ কবি-পরিচয়, সারসংক্ষেপ, কবিতার বিশ্লেষণ, শব্দার্থ

অধ্যায় ৩ ঃ **কবিতা — ৩** ৩৩-৪৩

গানভঙ্গ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কবি-পরিচয়, সার-সংক্ষেপ, কবিতার বিশ্লেষণ, শব্দার্থ

অধ্যায় ৪ ঃ **কবিতা — ৪** ৪৪-৫১

পুরাতন ভৃত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ঃ কবিতার সার-সংক্ষেপ, কবিতার বিশ্লেষণ, শব্দার্থ

অধ্যায় ৫ ঃ **উপন্যাস - *কপালকুণ্ডলা* — ১** ৫২-৬০

ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা, উপন্যাস-পরিচয়; কাহিনিসার

অধ্যায় ৬ ঃ **উপন্যাস - *কপালকুণ্ডলা* — ২** ৬১-৭৭

চরিত্র-বিচার ঃ নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি বা লুৎফউন্নিসা, কাপালিক; অলৌকিকতা

অধ্যায় ৭ ঃ **বনফুল — জাগ্রত দেবতা** ৭৮-৯৮

বনফুলের জীবন ও সাহিত্য; জাগ্রত দেবতা ঃ গল্পের সার সংক্ষেপ, গল্প-বিশ্লেষণ

অধ্যায় ৮ ঃ **বনফুল — বিশ্বাস মশাই** ৯৯-১১৫

বিশ্বাস মশাই — মূল পাঠ ঃ গল্পের সার-সংক্ষেপ, গল্প-বিশ্লেষণ

প্রসঙ্গ পুস্তক ১১৬

পাঠ-পরিচিতি ঃ নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনা

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিকের জন্য পাঠ্য আধুনিক ভারতীয় ভাষার (MIL) এই গ্রন্থটিকে দুটি খণ্ডে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম খণ্ডে আছে আটটি অধ্যায়। এই অধ্যায়গুলোতে কবিতা, উপন্যাস ও ছোটোগল্পকে স্থান দেওয়া হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে সাতটি অধ্যায়। এই অধ্যায়গুলোতে নাটক, জীবনচরিত, প্রবন্ধ, ব্যাকরণ ও সংবাদ, অনুচ্ছেদ রচনা ইত্যাদি বিষয়গুলো সন্নিবিষ্ট হয়েছে। উপন্যাস ও নাটকের মূল পাঠ এখানে দেওয়া সম্ভব নয়। তাই *কপালকুণ্ডলা* ও *সাজাহান* গ্রন্থদুটি আপানাদের ব্যক্তিগতভাবে সংগ্রহ করে নিতে হবে।

খণ্ড-পরিচিতি ঃ খণ্ড — ১

এই খণ্ডটি 'নির্বাচিত বাংলা সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনা' শীর্ষক পাঠ্যবিষয়ের প্রথম খণ্ড। এখানে মোট আটটি অধ্যায় রয়েছে। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগের কবিতা নিয়ে চারটি অধ্যায় আর উপন্যাস ও গল্পের জন্যে দুটি করে অধ্যায় যুক্ত হয়েছে।

কবিতা অংশ চারটি অধ্যায়ে বিভাজিত এবং এখানে মধ্যযুগীয় বাংলা কবিতার সঙ্গে উনিশ ও বিশ শতকের মোট ছয়টি প্রতিনিধিস্থানীয় কবিতা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। মাত্র কয়েকটি কবিতা দিয়ে বাংলা কবিতার ধারাকে বোঝানো যায় না। তবু বিষয়ের বিভিন্নতা, প্রকাশভঙ্গির অনন্যতা যুগে যুগে বাংলা কবিতায় কীভাবে প্রকাশ কেরেছে, এই নির্বাচিত কবিতাগুলোতে তার আভাস পাওয়া যাবে।

'উপন্যাস' অংশে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কপালকুণ্ডলা* পাঠ্যবিষয় বলে বিবেচিত হয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের আগেই বাংলা উপন্যাস রচনা শুরু হলেও তিনিই বাংলা সাহিত্যের প্রথম যথার্থ ঔপন্যাসিক। তাই তাঁর উপন্যাসকেই আমাদের বর্তমান পাঠক্রমের উপযুক্ত বলে মনে হয়েছে। তাছাড়া এই উপন্যাসটির অভিনবত্বও অনুপম। সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের কপালকুণ্ডলা উপন্যাসটি ইতিহাস-রোমান্স-অতিপ্রাকৃতের সমন্বয়ে বাংলা সাহিত্যের এক উজ্জ্বল সৃষ্টি। বহুচর্চিত এই উপন্যাসে বাংলার সমাজজীবনের একটি ছবিও খুব সুন্দরভাবে ফুটে উঠেছে। তিনি উপন্যাস রচনা করতে গিয়ে পাঠকের আগ্রহ সৃষ্টির জন্য গল্প রসের দিকে নজর দিয়েছিলেন। তাই তিনি রোমান্সের ফ্রেমটিই বেছে নিয়েছিলেন এবং সেই অনুযায়ী শিল্প-আদর্শকে রূপ দিতে পেরেছিলেন। 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' — রহস্যময়ী নারী কপালকুণ্ডলার এই উক্তি আজও বহু আলোচকের মনে নানা ভাবনার জন্ম দিচ্ছে।

বাংলা ছোটগল্পের অন্যতম শিল্পী বনফুল বা বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বিচিত্র জীবনরসে সমৃদ্ধ তাঁর গল্প বাংলা সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। বাংলা ছোটগল্পের এক বিশেষ পর্যায়ের তিনি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তাঁকে বিশদভাবে জানার জন্য *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প* বইটি থেকে দুটি গল্প নির্বাচন করা হয়েছে। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা ছোটগল্প যে আঙ্গিকবদল হয়েছে, শুধু বাংলার নয় তার বাইরের মাটি থেকেও সজীব রস আহরণ করে যে বাংলা গল্প সমৃদ্ধ হয়েছে, তা বনফুলের গল্প না পড়লে জানার জগত অপূর্ণ রয়ে যায়। তাঁর বিষয়-নির্বাচন এবং তাকে গল্পের ভাষায় ফুটিয়ে তোলা — এই দুটি দিকই গল্পগুলোতে তাঁর স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় দেয়। বর্তমান আলোচনা গল্পকারের এই স্বাতন্ত্র্যকে বুঝতে আমাদের সাহায্য করবে।

খণ্ডটির আলোচনা পাঠের সময় ডানদিকে বা বাঁ-দিকে কয়েকটি চতুষ্কোণক্ষেত্র চোখে পড়বে। এসবের মধ্যে মূল পাঠের অন্তর্গত অল্পপরিচিত শব্দ ও পরিভাষাসমূহের অর্থ, টীকা ইত্যাদি দেখতে পাবেন। 'আসুন, জেনে নিই' শীর্ষক ক্ষেত্রগুলিতে মূল পাঠের সঙ্গে জড়িত কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্যেরও ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত 'আপনাদের করণীয়' অংশ নিজেদের অধ্যয়নে আরও সক্রিয় করে তুলবে এবং এর থেকে যথেষ্ট সুফল পাওয়া যাবে। তদুপরি, 'অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন'-এর অনুশীলনের মাধ্যমে আপনারা নিজেই নিজের জ্ঞানের বিচার করতে পারবেন। অধ্যায়গুলির আলোচনা পাঠের সময় প্রশ্নসমূহের উত্তর আলাদাভাবে লিখে নিয়ে খণ্ডের শেষে সন্নিবিষ্ট 'অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর'এর সঙ্গে মিলিয়ে নিলে ভালো হয়। অধ্যায়টিতে আলোচিত বিভিন্ন ধারণাগুলির বিষয়ে অধিক জ্ঞানের জন্য 'অতিরিক্ত পঠন' শীর্ষক উল্লেখিত বইগুলি পথপ্রদর্শকের কাজ করবে। প্রতিটি অধ্যায়ের শেষে বার্ষিক পরীক্ষার জন্য সম্ভাব্য প্রশ্নাবলির কিছু নমুনা সংযুক্ত হয়েছে।

অধ্যায় ১ ঃ কবিতা — ১

অধ্যায়-বিন্যাস

১.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

১.২ পরিচিতি

১.৩ নবদ্বীপ — বৃন্দাবন দাস

- ১.৩.১ কবি-পরিচয়
- ১.৩.২ সারসংক্ষেপ
- ১.৩.৩ কবিতার বিশ্লেষণ
- ১.৩.৪ শব্দার্থ

১.৪ সমুদ্রের প্রতি — মাইকেল মধুসূদন দত্ত

- ১.৪.১ কবি-পরিচয়
- ১.৪.২ সারসংক্ষেপ
- ১.৪.৩ কবিতার বিশ্লেষণ
- ১.৪.৪ শব্দার্থ

১.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

১.৬ অতিরিক্ত পঠন

১.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

১.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

১.২ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- বৃন্দাবন দাস রচিত 'নবদ্বীপ' কবিতার কাহিনিভাগের সঙ্গে পরিচিত হবেন
- 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতাটি থেকে মাইকেল মধুসূদন দত্তের রচনারীতির পরিচয় জানতে পারবেন
- প্রতিটি কবিতার বিশ্লেষণ বা আলোচনাকে অবলম্বন করে অধ্যায়ের শেষে যে প্রশ্নগুলো দেওয়া হয়েছে তার উত্তর লিখতে পারবেন এবং কবিতার নির্বাচিত অংশের ব্যাখ্যাও করতে পারবেন।

১.২ পরিচিতি

দেখুন, বাংলা কবিতা বললে ছন্দে লেখা, প্রায়ই অন্তমিল যুক্ত কয়েকটি লাইন বা

পংক্তির যে ছবি আপনাদের চোখে ভাসে বা যাকে আপনারা কখনও কোনো বইতে এবং পত্র-পত্রিকায় দেখেছেন, তা কিন্তু বহুদিন আগেই লেখা শুরু হয়েছে। ধরুন সময়টা প্রায় দুহাজার বছর আগে। এখন থেকে যদি আমরা সেই সময়টাতে পিছিয়ে যেতে চাই তবে আপনাদের এক-দুই নয় একশো-দুশো বছর করে পিছিয়ে যেতে হবে। তবেই আপনারা এক সময় পৌঁছে যাবেন পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে। ১৪০১-১৫০০ (পঞ্চদশ শতক), ১৫০১/১৬০০ (ষোড়শ শতক)।

আপনাদের বর্তমান অধ্যায়ে যে দুটি কবিতা পড়তে হবে সেগুলো দুটো এই সময়কালের মধ্যেই লেখা হয়েছিল। তার পরে আপনারা পড়বেন উনিশ শতকে রচিত একটি ভিন্ন কবিতা। দুটি কবিতায় ভিন্ন ভিন্ন দুটি প্রসঙ্গের মুখোমুখি হবেন আপনারা।

এখানে বলে রাখি, আপনাদের পুরনো বাংলার ভাষা নয়, কবিতার বিষয়বস্তুকেই জেনে নিতে হবে। তবে সেটা তো ভাষার মাধ্যমেই করতে হবে, তাই এই কথাগুলো বলা হলো। বর্তমান অধ্যায়ে আপনারা তিনজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় জানবেন, কবিতার মূল বিষয় বা সার-সংক্ষেপ সম্বন্ধে জানবেন এবং কবিতার বিষয়বস্তুর বিশ্লেষণ পড়বেন।

১.৩ নবদ্বীপ — বৃন্দাবন দাস

নবদ্বীপ হেন গ্রাম ত্রিভুবনে নাঞি।
যদি অবতীর্ণ হৈলা চৈতন্য গোসাঞি।।
অবতরিবেন প্রভু জানিঞা বিধাতা।
সকল সম্পূর্ণ করি থুইলেন তথা।।
নবদ্বীপের সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
একো গঙ্গাঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে।।
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পঢ়িলে সে বিদ্যারস পায়।।
রমা-দৃষ্টিপাতে সর্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহার রসে।।
কৃষ্ণনাম ভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথম কলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার।।
'ধর্ম-কর্ম' লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে।।
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়ে।
এই সবে রত আর কিছু না জানয়ে।

যেবা ভট্টাচার্য চক্রবর্তী মিশ্র সব।
তাহারাও না জানয়ে গ্রন্থ-অনুভব।।
শাস্ত্র পড়াইয়া সভে এই কর্ম করে।
শ্রোতার সহিতে যম-পাশে বন্দী মরে।।
না বাখানে যুগধর্ম কৃষ্ণের কীর্তন।
দোষ বহি গুণ কারো না করে কথন।।
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা' সভার মুখেও নাহিক হরিধ্বনি।।
অতি বড় সুকৃতি সে স্নানের সময়ে।
'গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ' নাম উচ্চারয়ে।।
গীতা-ভাগবতে যে যে জনে বা পঢ়ায়ে।
ভক্তির ব্যাখ্যান নাহি তাহার জিহ্বায়ে।।
এইমত বিষ্ণুমায়া-মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার।।
কেমতে এসব জীব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার।।
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।।
স্বকার্য করেন সব ভাগবতগণ।
কৃষ্ণপূজা গঙ্গাস্নানে কৃষ্ণের কথন।।
সভে মেলি জগতেরে করে আশীর্বাদ।
শীঘ্রে কৃষ্ণচন্দ্র করো সভারে প্রসাদ।।

(শ্রীচৈতন্যভাগবত)

১.৩.১ কবি-পরিচয়

বাংলা ভাষায় লেখা মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের জীবনীগুলোর মধ্যে সব থেকে প্রামাণ্য, তথ্যনির্ভর এবং পুরনো জীবনীগ্রন্থ হচ্ছে বৃন্দাবন দাসের রচিত 'চৈতন্যভাগবত'। এই গ্রন্থেরই আদি পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে আপনাদের পাঠ্য কবিতাংশটি নেওয়া হয়েছে। বৃন্দাবন দাসের জন্মকাল বা 'চৈতন্যভাগবতে'র রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতবিরোধ রয়েছে। আনুমানিক ১৫১৮ - ১৯ খ্রিস্টাব্দে তাঁর বৃন্দাবনে জন্ম হয়। আর আনুমানিক ১৫৪২ থেকে ১৫৪৮ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কোনো এক সময়ে গ্রন্থটি রচিত হয়। তবে এ-কথা ঠিক যে বৈষ্ণবদের মধ্যে এ-গ্রন্থের জনপ্রিয়তা ছিল।

১.৩.২ সারসংক্ষেপ

এই কবিতায় চৈতন্যদেবের জন্ম হওয়ার আগে নবদ্বীপের অবস্থা কেমন ছিল, তা বলা হয়েছে। আপনারা জানেন, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গে অবস্থিত নবদ্বীপ অঞ্চল শিক্ষায় সংস্কৃতিতে প্রাচীন কাল থেকেই অগ্রগণ্য। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে তা একটি বৈষ্ণব তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হয়। বৃন্দাবন এই নবদ্বীপের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলছেন, চৈতন্য এখানে জন্ম নেবেন জেনেই বিধাতা যেন তাঁর আবির্ভাবের সমস্ত আয়োজন করে রেখেছেন। এখানে লক্ষ লক্ষ লোক আসেন বিদ্যাচর্চার জন্য, কিন্তু এই চর্চা শুধুমাত্র ব্যবহারিক বিদ্যা বা কেজো বিদ্যার চর্চা। ধর্মকর্ম বলতে শুধু দেবী চণ্ডীর আরাধনা, কেউ কৃষ্ণনাম নেয় না। বিষ্ণু-মায়ায় সবাই মোহিত। লোকেদের মনে শুধু বিষয়-সুখের ভাবনা। এই অধঃপতিত সমাজকে উদ্ধারের জন্য 'কৃষ্ণচন্দ্র' শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও আশীর্বাদ চেয়েছেন কবি।

১.৩.৩ কবিতার আলোচনা

আপনারা দেখুন কীভাবে চৈতন্যদেবের জন্মের ঠিক আগে নবদ্বীপের সমাজ-চিত্র কবির কলমে ফুটে উঠেছে।

নবদ্বীপ হেন ..... থুইলেন তথা— কবি যখনকার বর্ণনা দিচ্ছেন তখন নবদ্বীপ একটি গ্রাম। ত্রিভুবনে কোথাও এমন জায়গা আর নেই। চৈতন্যদেব সেখানে অবতার রূপে জন্ম নেবেন জেনেই যেন বিধাতা সমস্ত আয়োজন সম্পন্ন করে রেখেছেন। চৈতন্য বৈষ্ণবধর্ম প্রচার করে নবদ্বীপকে এবং সেখানকার মানুষকে অধঃপতনের হাত থেকে উদ্ধার করবেন, বিধাতা তাই সমস্ত নবদ্বীপে এমন অবস্থা করে রেখেছেন যে চৈতন্যদেবের উদ্দেশ্য সফল হয়। তিনি বৈষ্ণব ধর্ম প্রচার করে সবার মঙ্গল করবেন।

নবদ্বীপের সম্পত্তি ..... ব্যবহার রসে— কবি বলছেন,নবদ্বীপের মহিমা বা ঐশ্বর্যের বর্ণনা করা বেশ কঠিন কাজ। চৈতন্য-ভক্ত বৃন্দাবন এখানে যেন একটু ব্যঙ্গের সুরেই কথাগুলো বললেন। প্রশংসার আড়ালে নিন্দা এই কথাগুলো থেকে স্পষ্ট। তাঁর বর্ণনা পড়ুন— নবদ্বীপের গঙ্গাঘাটে প্রায় এক লক্ষ লোক রোজ স্নান করেন। নানা জায়গা থেকে বিদ্যাশিক্ষা করার জন্য লোকেরা নবদ্বীপে আসেন। লক্ষ্মীর আশীর্বাদে সবাই সেখানে সুখে বসবাস করেন। তবে সাংসারিক বা বৈষয়িক বিষয়ে মনোনিবেশ করেই তাঁরা সময় কাটান বা সময় নষ্ট করেন।

কৃষ্ণনাম - ভক্তিশূন্য ..... কিছু না জানয়ে— পুরাণে যে চারটি কালের কথা বলা আছে (সত্যযুগ, ত্রেতাযুগ, দ্বাপরযুগ ও কলিযুগ) তার চতুর্থটি হলো কলি। কবি বলছেন, কলিযুগের প্রথম ভাগ থেকেই নবদ্বীপের মানুষ বিষয়চিন্তায় মগ্ন হয়েছে। সংসারে কিছু আচার-আচরণ লোকে পালন করে, কৃষ্ণকে ভক্তি বা ভজনা কেউ করে না। ধর্ম-

কর্ম বলতে একমাত্র মঙ্গলচণ্ডীর ব্রত। অনেক টাকা খরচ করে, কেউ কেউ বিষহরি বা মনসাদেবীর মূর্তি বানিয়ে পুজো করে। ছেলেমেয়েরে বিয়েতেও প্রচুর টাকা নষ্ট করে। এ-সব নিয়েই তারা আছে।

যেবা ভট্টাচার্য ..... নাহিক হরিধনি— ভট্টাচার্য, চক্রবর্তী, মিশ্র প্রভৃতি উপাধিধারী কুলীন ব্রাহ্মণেরাও গ্রন্থ পাঠ করে যথার্থ জ্ঞান লাভ করতে পারেননি। শাস্ত্র বচন পড়ে ও শুনিয়ে তাঁরা নিজেরাও শ্রোতাদের সঙ্গে অজ্ঞানতার মধ্যে বন্দী হয়ে আছেন। অর্থাৎ তাঁরা নিজেরা তো যথার্থ জ্ঞান লাভ করেনই না উপরন্তু শ্রোতাদেরও সেই অজ্ঞানতা দিয়ে বেঁধে রাখেন। এই পণ্ডিতেরা কৃষ্ণের কীর্তন করেন না, কৃষ্ণনামই যে যুগের ধর্ম তা-ও বলেন না। দোষ বা ত্রুটি ছাড়া কারও গুণের কথা তাঁরা উচ্চারণ করেন না। যে-সব পণ্ডিত এ-ধরনের অজ্ঞানীদের উপর বিরক্ত তাঁরাও কিন্তু মুখে হরিনাম নেন না। অর্থাৎ নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ নানা শাস্ত্র-বচনে পাণ্ডিত্য অর্জন করলেও কৃষ্ণকে সম্পূর্ণ ভুলে গেছেন। কবি এসব কথা বলে বোঝাতে চাইছেন যে শাস্ত্রে হরি বা কৃষ্ণের প্রসঙ্গ থাকলেও পণ্ডিতেরা তাঁকে স্মরণ করছেন না। এটা কেন হচ্ছে, তার কারণ কবি পরে ব্যাখ্যা করেছেন।

অতি বড় সুকৃতি .... তাহার জিহ্বায়ে— পণ্ডিতেরা একমাত্র ভালো কাজ এটাই করেন যে স্নানের সময় '*গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ*' (কৃষ্ণের দুটি নাম) নামমাত্র উচ্চারণ করেন। গীতা বা ভাগবত যাঁরা জানেন বা পড়ান তাঁরাও কিন্তু এই গ্রন্থের কোনো ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করেন না। অর্থাৎ ঐ দুটি গ্রন্থের বক্তব্য তাঁরা শ্রোতাদের বুঝিয়ে বলতে পারেন না।

এইমত বিষ্ণুমায়া ..... করেন ব্যাখ্যান— কবি এবার নবদ্বীপের এই অবস্থার মূল কারণ বলছেন। কবির মতে এটা বিষ্ণুমায়ার ফল। সমস্ত নবদ্বীপ ও তার অধিবাসীরা বিষ্ণু-মায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছেন বলেই বিষ্ণুকে ভুলে বৈষয়িক চিন্তায় মগ্ন। তাই বিষ্ণুর ভক্তেরা দুঃখিত মনে জীবের উদ্ধারের কথা ভাবেন। কীভাবে যে সমাজকে বাঁচানো যায় ! বিষয়-সুখে মোহিত হয়ে এমন অবস্থা হয়েছে যে, বললেও কেউ কৃষ্ণনাম নেন না। বরং সবসময় নিজেদের অসার বিদ্যা ও বংশের গুণগান করতেই ভালবাসেন।

স্বকার্য করেন ..... সভারে প্রসাদ— একমাত্র ভাগবত বা কৃষ্ণভক্তরাই কৃষ্ণপূজা, গঙ্গাস্নান ও কৃষ্ণের নাম প্রচার করেছেন— যেটা তাঁদের কাজ। তাঁরা সবাই মিলে সমস্ত জগতকে এই বলে আশীর্বাদ করছেন যে, কৃষ্ণচন্দ্র অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ যেন খুব শিগগিরই সবাইকে অনুগ্রহ করেন। অর্থাৎ নবদ্বীপে আবির্ভূত হয়ে সবার কল্যাণ করেন।

১.৩.৪ শব্দার্থ

জাগরণ — চণ্ডীর গান। হেন — মতো।

কেমতে — কীভাবে। সভার — সবার।
নাঞি — নেই। প্রথম কলি — কলিযুগের।
পাশে — বন্ধনে। প্রসাদ — অনুগ্রহ প্রথম ভাগ।
সভে — সবাই। সুকৃতি — ভালো কাজ।
থুইলেন — রাখলেন। কুল — বংশ।
ভবিষ্য-আচার — নানা সাংসারিক রীতি-নীতি।
মোহিত — মুগ্ধ। বিষহরি— মনসাদেবী।
বিভায়ে — বিবাহে। মজিল — মগ্ন হলো বা ব্যস্ত হলো।
বসে — বসবাস করে। ব্যবহার রস — সাংসারিক বা বৈষয়িক কাজ।
কৃষ্ণচন্দ্র — কৃষ্ণ, কালাচাঁদ। বাখানে — ব্যাখ্যা করে। রমা — লক্ষ্মী।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

(ক) নবদ্বীপ কবিতাটি কোন গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে?

.....

(খ) কবে বৃন্দবান দাস জন্মগ্রহণ করেন?

.....

(গ) কৃষ্ণচন্দ্র কে?

.....

(ঘ) নবদ্বীপে দেশ-দেশান্তর থেকে কেন লোকেরা আসতেন?

.....

(ঙ) কার দৃষ্টিপাতে সবাই নবদ্বীপে সুখে বসবাস করেন?

.....

(চ) দম্ভ করে কোন দেবীর পুজো নবদ্বীপের লোকেরা করেন?

.....

(ছ) কার মায়ায় সংসার মোহিত?

.....

(জ) ..... সব মজিল সংসার। — শূন্যস্থান পূর্ণ করুন।



আসুন, জেনে নিই —

জাগরণ — মঙ্গলচণ্ডীর গান চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাত জেগে গাওয়া হতো বলে এর আর এক নাম জাগরণ। আট (৮) রাত ধরে এই গান গাওয়া হতো।

১.৪ সমুদ্রের প্রতি — মাইকেল মধুসূদন দত্ত

কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ ! হা ধিক্, ওহে জল-দল-পতি !
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি ? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর ? কোন গুণে কহ, দেব, শুনি,
কোন গুণে দাশরথি কিনেছে তোমারে ?
প্রভঞ্জন বৈরী তুমি; প্রভঞ্জনসম
ভীম পরাক্রমে ! কহ, এ নিগড় তবে
পর তুমি কোন পাপে ? অধম ভালুকে
শৃঙ্খলিয়া যাদুকর, খেলে তারে লয়ে;
কেশরীর রাজপদ কার সাধ্য বাঁধে
বীতংসে ? এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষঃস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি ?
উঠ, বলি ঃ বীরবলে এ জাঙাল ভাঙি,
দূর কর অপবাদ, জুড়াও এ জ্বালা,
ডুবায়ে অতল জলে এ প্রবল রিপু।
রেখো না গো তব ভালে এ কলঙ্ক-রেখা,
হে বারীন্দ্র, তব পদে এ মম মিনতি।।

১.৪.১ কবি-পরিচয়

১৮২৪ খ্রিস্টাব্দের ২৫ জানুয়ারি বর্তমান বাংলাদেশের যশোর জেলার সাগরদাঁড়ি গ্রামে মধুসূদন জন্মগ্রহন করেন। তাঁর পিতার নাম রাজনারায়ণ দত্ত এবং মাতা জাহ্নবী দেবী। ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে হিন্দু কলেজে পড়ার সময় তাঁর কবিত্বপ্রতিভার প্রকাশ ঘটে। বিভিন্ন ইংরেজি পত্র-পত্রিকায় তাঁর কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। তাঁর বিশ্বাস ছিল, বিলাত গেলে বড় কবি হতে পারবেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি ১৮৪৩ খ্রিস্টাব্দে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করেন। তখন থেকে তাঁর নামের আগে 'মাইকেল' শব্দটি বসে। দেশি ও বিদেশি বেশ কয়েকটি ভাষা তিনি আয়ত্ত করেছিলেন। নিজের রচনাতেও বিদেশি সাহিত্যের অনুসরণ লক্ষ করা যায়। অবশ্য প্রথমে তিনি ইংরেজিতেই লেখা শুরু

করেছিলেন। পরে প্রতিষ্ঠা লাভে ব্যর্থ হয়ে এবং অনুরাগী বন্ধুদের পরামর্শে কবি বাংলায় লেখা শুরু করেন। খুব কম সময়ের মধ্যে তিনি বহু নাটক ও কাব্য লিখেছেন। তাঁর প্রথম বাংলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা' নাটক (১৮৫৯)। পরের বছর দ্বিতীয় নাটক 'পদ্মাবতী'তে প্রথম অমিত্রাক্ষর ছন্দ প্রবর্তনের চেষ্টা করেন। এই বছরই মধুসূদন তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'তিলোত্তমাসম্ভব কাব্যে' এই ছন্দের পূর্ণ প্রয়োগ করেন। আর ১৮৬১-তে প্রকাশিত 'মেঘনাদবধকাব্যে' তার সৌন্দর্যসাধন করে কবি বাংলা সাহিত্যে অক্ষয়কীর্তি রেখে গেছেন।

আপনাদের পাঠ্য কবিতাটি এই 'মেঘনাদবধ কাব্য' থেকেই নেওয়া হয়েছে। কাব্যটির প্রথম সর্গে সমুদ্রকে উদ্দেশ করে রাবণ কবিতার কথাগুলো বলেছিলেন। মূল কাব্যটির আখ্যান তৈরি হয়েছে 'রামায়ণের' সীতা উদ্ধার কাহিনিকে কেন্দ্র করে। সমুদ্র বন্ধন করে বানরসেনাদের নিয়ে রাম লঙ্কা অবরোধ করেছেন। রাবণের সেনার সঙ্গে তাঁদের যুদ্ধও হচ্ছে। হঠাৎ একদিন খবর এল যুদ্ধে তাঁর প্রিয় পুত্র বীরবাহু বীরগতি প্রাপ্ত হয়েছেন। রাবণ খবর পেয়ে প্রাসাদের ছাদে উঠে দেখলেন, সত্যিই তাঁর পুত্র বীরবাহুর মৃতদেহ মাটিতে পড়ে আছে। পুত্রশোকে আকুল হলেন তিনি। বিলাপ করতে করতে দেখলেন অদূরে সমুদ্র। তখন সমুদ্রকে লক্ষ করে যে কথাগুলো রাবণ বললেন, সেটাই বর্তমান কবিতাটিতে আছে।

১.৪.২ সারসংক্ষেপ

কবিতাটিতে বক্তা রাবণ সমুদ্রের শক্তির কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে তার কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন যাতে সে নিজের কলঙ্ক দূর করে। কীসের কলঙ্ক? রামের নির্দেশে বানর-সেনা পাথর দিয়ে যে সমুদ্রকে বেঁধে ফেলেছে, সেই কলঙ্ক। সেই 'রামসেতু'কে দেখে রাবণের মনে হয়েছে অপরিসীম শক্তিধর সমুদ্র আজ গলায় মালা পরেছে। ধিক্কার দিয়েছেন রাবণ অলঙ্ঘ্য, অজেয় সমুদ্রকে। তাঁর প্রশ্ন, রামের এমন কী গুণ আছে যা দিয়ে সাগরকে বশ করা যায়? সমুদ্রের সঙ্গে সিংহের তুলনা করে রাবণ বলছেন, অধম ভালুকের পায়ে শিকল বেঁধে মাদারিরা খেলা দেখাতে পারে, কিন্তু পশুরাজ সিংহকে কার সাধ্য ফাঁদে ফেলে। শ্রীবিষ্ণুর বুকের কৌস্তুভমণির মত লঙ্কা নগরী, তার প্রতি সমুদ্র কেন নির্দয় হলেন তা রাবণ বোঝেন না। তাই সমুদ্রের কাছে মিনতি করেন এই বলে যে, যেন সে জলের অতলে পাথরের বন্ধনকে ডুবিয়ে দিয়ে নিজের অপবাদ দূর করে।

১.৪.৩ কবিতার বিশ্লেষণ

কি সুন্দর মালা ..... রত্নাকর ? — রাবণ এখানে সমুদ্রকে বিদ্রূপ করে বলছেন, যে সমুদ্র পারাপার করা যায় না, যাকে জয় করা যায় না — তার পক্ষে মালার বাঁধনে

বন্দী হওয়া মানায় না। রত্নাকর বলে সম্বোধন করে তাকে রাবণ প্রশ্ন করেছেন, ওই মালা কি তার অঙ্গের বা দেহের অলংকার হতে পারে?

এই পংক্তিগুলোতে পুত্রহারা রাবণের ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে। তিনি কিছুতেই মানতে পারছেন না যে বিশাল সমুদ্র রামের বশ্যতা স্বীকার করে বন্ধন দশাকে মেনে নিয়েছে। এখানে যে মালার কথা বলা হয়েছে তা আসলে পাথরের নির্মিত সেতু, যা বানর-সেনার সহায়তায় রাম বানিয়েছিলেন। এটি রামায়ণে উল্লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কিন্তু পুত্র বীরবাহুকে হারিয়ে রাবণ রামের সমুদ্র-বন্ধনকে বিনাশের মূল বলে ভাবছেন। তাই সমুদ্রের প্রতি তাঁর ক্ষোভের প্রকাশ ঘটেছে।

কোন গুণে, কহ, ... বীতংসে — এবার তিনি সমুদ্রকে প্রশ্ন করেছেন, বায়ুর মতো প্রচণ্ড বলশালী যে, তাকে রাম কোন গুণ দিয়ে কিনে নিয়েছে? কোন পাপে সমুদ্র এ-বন্ধনকে স্বীকার করেছে? তারপরে একটি তুলনা দিয়েছেন রাবণ। যারা পশুদের নিয়ে খেলা দেখায় তারা এক অধম ভালুকের পায়ে শিকল বেঁধে খেলা দেখাতে পারে। কিন্তু তাদের পক্ষে সিংহকে ফাঁদে ফেলে তার পায়ে শিকল বাঁধা সম্ভব নয়।

সমুদ্রকে সিংহের সঙ্গে তুলনা দিয়ে রাবণ এখানে তাকে উদ্বুদ্ধ করতে চাইছেন, যাতে সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে সচেতন হয়। সমুদ্র তো আর ভালুকের মতো অধম নয় যে নাচিয়েদের কথা মতো পায়ে শিকল বাঁধা অবস্থায় নাচবে বা তাদের বশীভূত হবে। অন্যদিকে পরোক্ষভাবে রামকে, যারা পশুদের নিয়ে খেলা দেখায়, তাদের সঙ্গে তুলনা করলেন। অর্থাৎ দেবতুল্য রামকে মাদারিদের স্তরে নামিয়ে আনলেন।

এই যে লঙ্কা ..... তুমি এর প্রতি? — সমুদ্রের বুকে রাবণের স্বর্ণলঙ্কা বিরাজমান অর্থাৎ অবস্থান করছে। এ-কথা বলে রাবণ বলছেন, লঙ্কার প্রতি কেন সমুদ্র এত নির্দয় হলেন। লঙ্কা তো তার কাছে বিষ্ণুর বুকে অবস্থিত কৌস্তুভমণির মতো।

রাবণ মনে করেছেন, সমুদ্রের প্রিয় — তার বুকের মণি লঙ্কার প্রতি সমুদ্র নির্দয় হয়েছে বলেই রামকে সেতুবন্ধনে সে সাহায্য করেছে।

উঠ বলি ..... এখন মিনতি — এখানে রাবণ সমুদ্রকে বলছেন বীরদর্পে সেতুবন্ধন ভেঙে দিয়ে সে যেন নিজের অপবাদ দূর করে। গভীর জলের নীচে যেন এই শত্রুকে অর্থাৎ মালাস্বরূপ সেতুকে ডুবিয়ে দেয়। রাবণ প্রার্থনা জানিয়েছেন, সমুদ্র যেন তার কপাল থেকে এইভাবে কলঙ্করেখা মুছে ফেলে।

এই কলঙ্ক আসলে মহাশক্তিমান হয়েও অপরের বশ্যতা স্বীকারের কলঙ্ক। তার ওপরে লঙ্কানগরী সমুদ্রের বুকের মণির মতো। সেই লঙ্কাকেই ধ্বংস করতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার অপবাদ যেন সমুদ্রের গায়ে না লাগে। এজন্য রাবণ এই কথাগুলো এখানে বলেছেন।

১.৪.৪ শব্দার্থ

প্রচেতঃ— জলাধিপতি, সমুদ্র।
অজেয় — যাকে জয় করা যায় না।
রত্নাকর — সমুদ্র, রত্নের খনি।
প্রজ্ঞান — বাতাস।
পরাক্রমে — শক্তিতে, বিক্রমে।
নিগড় — শৃঙ্খল, শিকল
বীতংস — ফাঁদ
নীলাম্বুস্বামি — সিন্ধু, সমুদ্র
মাধব — বিষ্ণু
জাঙাল — সেতু
রিপু — শত্রু
ভালে — কপালে
অলঙ্ঘ্য — যা লঙ্ঘন করা যায় না।
ভূষণ — অলংকার, গয়না।
দাশরথি — দশরথের পুত্র, রাম।
বৈরী — শত্রু।
ভীম — ভীষণ
কেশরী — সিংহি
হৈমবতী — সোনার তৈরি
কৌস্তুভ মণি — সমুদ্রমন্থনে পাওয়া গিয়েছিল যা বিষ্ণু বুকের অলংকার হিসেবে পরতেন।
বারীন্দ্র — সমুদ্র



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ২ ঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

(ক) বাংলা ভাষার শেষ যথার্থ সারস্বত মহাকাব্য কোনটি?

.....

(খ) মধুসূদন কোন কাব্যছন্দটি তৈরি করেছেন?

.....

(গ) কখন মধুসূদনের আগে 'মাইকেল' শব্দটি বসেছিল?

.....

(ঘ) কোন মহা কাব্য অবলম্বনে 'মেঘনাদবধকাব্য' রচিত হয়েছে?

.....

(ঙ) 'প্রচেত' শব্দটির অর্থ কী? 'জল-দল-পতি' কে?

.....

(চ) দশরথি কাকে বলে এবং কেন?

.....

(ছ) 'কেশরীর রাজপদ' বলার অর্থ কী?

.....

(জ) কৌস্তুভ রতন কোথায় আছে?

.....

(ঝ) 'জাঙাল' শব্দের অর্থ কী?

.....



১.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- যে দুটি কবিতা পড়া হল সেগুলোর প্রথমটি বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে রচিত হয়েছে। সময়কাল পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক।
- 'বংশীনাদে' কবিতায় বিরহিনী রাধার কাতরতার ছবি ফুটে উঠেছে।
- শ্রীচৈতন্যের জন্মের আগে নবদ্বীপ অঞ্চলের সমাজ তথা লোক-জন , আচার-ব্যবহার কেমন ছিল তা জানা যায় 'নবদ্বীপ' কবিতায়।
- মধুসূদনের কাব্য-প্রতিভার স্বরূপ। তাঁর ভাষা ব্যবহারে প্রচুর আভিধানিক শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়।
- রাবণের অন্তরের ক্ষোভ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে সমুদ্রর প্রতিটি কবিতায়।



১.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) গুপ্ত, ক্ষেত্র; *মধুসূদনের কবি আত্মা ও কাব্যশিল্প ।*

২) বসু, শঙ্করীপ্রসাদ; *মধ্যযুগের কবি ও কাব্য।*

৩) বিশী, প্রমথনাথ; *বাংলার লেখক ও কবি।*

৪) মুখোপাধ্যায়, অরুণকুমার; *উনিবিংশ শতাব্দীর শতকের গীতি কাব্য।*

৫) রায়, কালিদাস, *পদাবলী সাহিত্য।*

৬) সিকদার, অশ্রুকুমার, *হাজার বছরের বাংলা কবিতা।*

৭) সেন, সুকুমার (সম্পা); *চৈতন্যভাগবত।*

৮) সেন, সুকুমাব; *বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস (১ম, ২য় এবং ৫ম খণ্ড)।*

১.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (ক) *চৈতন্যভাগবত* গ্রন্থের আদিপর্বের অন্তর্গত দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে।

(খ) আনুমানিক ১৫১৮ - ১৯ খ্রিস্টাব্দে।

(গ) শ্রীকৃষ্ণ।

(ঘ) বিদ্যালাভ করার জন্য, বিশেষ করে শাস্ত্রবিদ্যা।

(ঙ) রমা অর্থাৎ লক্ষ্মী।

(চ) বিষহরি বা মনসাদেবী।

(ছ) বিষ্ণু-মায়ায়।

(জ) বিষয়-সুখেতে।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (ক) মাইকেল মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধকাব্য।*

(খ) অমিত্রাক্ষর।

(গ) ১৮৪৩ সালে খ্রিস্টধর্ম গ্রহণ করার পর।

(ঘ) রামায়ণ।

(ঙ) সমুদ্র। সমুদ্র।

(চ) রামকে। যেহেতু তিনি দশরথের পুত্র।

(ছ) সিংহ বনের রাজা। সুতরাং তার পা রাজার পা।

(জ) মাধব অর্থাৎ বিষ্ণুর কণ্ঠে।

(ঝ) সেতু।



১.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ নবদ্বীপের পণ্ডিতদের যে পরিচয় তুলে ধরা হয়েছে তা অনধিক ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

প্রশ্ন ২ ঃ 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় রাবণের মনের ভাব কীভাবে প্রকাশ পেয়েছে তা অনধিক ৪০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ "কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে, প্রচেতঃ!"— এ-কথা রাবণ কেন বলেছেন, অনধিক ২০০ শব্দের মধ্যে লিখুন।

প্রশ্ন ৪ ঃ ব্যাখ্যা লিখুন (১৫০ শব্দের মধ্যে)—

(ক) ধর্ম-কর্ম লোক সভে এইমাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে।।
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জনে।
পুত্তলি করয়ে কেহো দিয়া বহু ধনে।।

(খ) এইমত বিষ্ণুমায়া -মোহিত সংসার।
দেখি ভক্ত সব দুঃখ ভাবেন অপার।।
কেমতে এসব জীব পাইবে উদ্ধার।
বিষয়-সুখেতে সব মজিল সংসার।।
বলিলেও কেহো নাহি লয় কৃষ্ণনাম।
নিরবধি বিদ্যা কুল করেন ব্যাখ্যান।।

(গ) কি সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে,
প্রচেতঃ। হা ধিক্, ওহে জল-দল-পতি!
এই কি সাজে তোমারে, অলঙ্ঘ্য, অজেয়
তুমি? হায়, এই কি হে তোমার ভূষণ,
রত্নাকর?

(ঘ) এই যে লঙ্কা, হৈমবতী পুরী,
শোভে তব বক্ষস্থলে, হে নীলাম্বুস্বামি,
কৌস্তুভ-রতন যথা মাধবের বুকে,
কেন হে নির্দয় এবে তুমি এর প্রতি?

*** ***** ***

অধ্যায় ২ ঃ কবিতা— ২

অধ্যায়-বিন্যাস

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

২.২ পরিচিতি

২.৩ রুপাই — জসিমউদ্‌দীন

২.৩.১ কবি-পরিচয়

২.৩.২ সারসংক্ষেপ

২.৩.৩ কবিতার বিশ্লেষণ

২.৩.৪ শব্দার্থ

২.৪ পুরনো কাগজের ফিরিওলা — প্রেমেন্দ্র মিত্র

২.৪.১ কবি-পরিচয়

২.৪.২ সারসংক্ষেপ

২.৪.৩ কবিতার বিশ্লেষণ

২.৪.৪ শব্দার্থ

২.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

২.৬ অতিরিক্ত পঠন

২.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

২.৮ আর্হি প্রশ্নাবলি

২.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনারা জানবেন —

- 'রুপাই' কবিতায় গ্রাম বাংলার অনুপম প্রকৃতিচিত্রের সঙ্গে আদর্শ পল্লীযুবকের ছবি আছে
- প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় আছে মানুষের জীবনে একটি করুণ রসের ব্যঞ্জনা।

২.২ পরিচিতি

আমরা পৌঁছে গেছি আপনাদের পাঠ্য 'মাধুকরী' কাব্য সংকলনের শেষ পর্বে। এতক্ষণে আপনারা নিশ্চয়ই লক্ষ করছেন যে কবিতা-পাঠের ক্ষেত্রে একটা নির্দিষ্ট ক্রম বা ধারাবাহিকতা মেনে আপনারা এ-পর্যন্ত এগিয়ে এসেছেন। আগের অধ্যায়ে আমরা উল্লেখ করেছি যে, যাঁদের কবিতা আপনারা পড়লেন তাঁদের সমসাময়িক আরও অনেক কবির কথা

জানতে পারবেন অতিরিক্ত পঠনের সূত্র অনুসরণ করে। তাহলে বাংলা সাহিত্যের ধারাবাহিকতার স্বরূপ আরও অনেকটাই স্পষ্ট হবে আপনাদের কাছে। আমরা পঞ্চদশ-ষোড়শ শতক থেকে উনিশ শতক, সেখান থেকে পৌঁছে গেছি বিশ শতকে। আপনারা যে শতকে জন্মেছেন, আসুন জেনে নিন সেই সময়ে কারা কী ধরনের কবিতা লিখেছেন। যে তিনজনের কবিতা আপনাদের পড়তে হবে তাঁরা ছাড়াও আরও বহু কবি এই সময়ে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছেন। তাঁদের সম্বন্ধে জানতে অবশ্যই অতিরিক্ত পঠন অংশের সাহায্য আপনারা নেবেন।

আপনাদের আধুনিক কবিতা' সম্বন্ধে সামান্য দু-চার কথা জেনে নেওয়া প্রয়োজন। 'আধুনিক' শব্দটার অর্থ আপনারা যদি অভিধানে খোঁজেন (সাধারণত 'আকাদেমি বিদ্যার্থী বাংলা অভিধান' দেখবেন। অভিধানটি দেখুন, বাংলা ভাষা বোঝা অনেক সহজ হয়ে যাবে) তবে পাবেন 'এখনকার', 'হাল আমলের', 'সাম্প্রতিক কালের' ইত্যাদি অর্থ। তাহলে বাংলা আধুনিক কবিতা বলতে কি তা-ই বোঝাচ্ছে যা এখন লেখা হচ্ছে? এখনকার লেখাতো অবশ্যই আধুনিক। কিন্তু বাংলা আধুনিক কবিতার শুরু বিশেষ একটি সময়ে এবং বিশেষ কিছু বৈশিষ্ট্যকে কেন্দ্র করে। সেই সময়টা হল মোটামুটি ভাবে বিশ শতকের দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক অর্থাৎ ১৯২০-এর কাছাকাছি সময়। রবীন্দ্রনাথ তখন জীবিত এবং বাংলা সাহিত্যে তাঁর প্রভাবকে অস্বীকার করে কিছু লেখা তখন প্রায় অসম্ভব ছিল। সেই অসম্ভবকেই সম্ভব করে দেখিয়েছিলেন কয়েকজন তরুণ কবি। রবীন্দ্রনাথ থেকে ভিন্ন ধরনের কবিতা লেখা শুরুর কাজটা করেছিলেন কবি নজরুল ইসলাম, মোহিতলাল মজুমদার এবং যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত। তাকেই গাঢ়তর করে তুললেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, প্রেমেন্দ্র মিত্র, অমিয় চক্রবর্তী, জীবনানন্দ দাশ, অজিত দত্ত, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবি। মূলত 'কল্লোল' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে এই কবিরা নতুন যুগের কথা নতুন ধরনে লিখতে শুরু করলেন। ইংরেজ , ফরাসি ও আমেরিকান কবি-সাহিত্যিকদের রচনার ঢঙ এঁদের লেখার আদর্শ হয়ে উঠল। বাংলা সাহিত্যকে এঁরা এতটাই প্রভাবিত করলেন যে ***'কল্লোল যুগ'*** নামে সময়টি চিহ্নিত হয়ে গেল। বাংলা বিদ্যাচর্চার জগতে যাকে আমরা আধুনিক কবিতা বলি, তা এইসব কবিদের কলমেই লেখা হয়েছিল।

আপনাদের যে দুজন কবির কবিতা এখানে পড়তে হচ্ছে তাঁরা সকলে বিশ শতকের প্রথম দশকেই জন্মগ্রহণ করেন। এঁদের কাব্যচর্চা শুরু হয় ১৯২২-২২ সাল নাগাদ। এঁদের মধ্যে জসিমউদ্‌দীন বাংলার পল্লীকবি হিসাবে খ্যাত। বিভিন্ন কবিতায় পল্লীবাংলার ছবি তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র সাধারণ মানুষের জীবন-রূপকার।



কল্লোল যুগ ঃ এই নামে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তর লেখা একটি চমৎকার বই আছে। বইটিতে সেই সময়কার আধুনিক কবিদের নানা অজানা কথা লেখা আছে।

২.৩ রুপাই — জসিমউদ্দীন

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখেই কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল।
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,

তার সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া।
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দু'খান সরু;
গা-খানি তার শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু।
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লি-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল।
কচি ধানের তুলতে চারা হয়তো কোনো চাষী,
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি।

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি।
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যে জন সোনা বানায়, কিসের গরব তার,—
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যে জন আলো বানায় ভুলায় সবার মন,
তারি পদরজের লাগি লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক।
যে-কালো তার মাঠেরি ধান, যে-কালো তার গাঁও
সেই কালোতে সিনান করি উজল তাহার গাও।

আখড়াতে তার বাঁশের লাঠি অনেক মানে মানী,
খেলার দলে তারে নিয়েই সবার টানটানি!
'জারী'র গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
'শাল-সুন্দী' বেত যেন ও, সকল কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়,— 'ছেলে নয়, ও 'পাগল' লোহা যেন!
রুপাই যেমন বাপের বেটা কেউ দেখেছ হেন?
যদিও রূপা নয়কো রুপাই— রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী।'

২.৩.১ কবি-পরিচয়

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে কবি

জসিমউদ্‌দীনে -র জন্ম হয় (১৯০৪ - ১৯৭৬)। পাশ্চাত্য আদর্শের অনুপ্রেরণায় রচিত বাংলা কাব্যধারার মধ্যেও যাঁরা পল্লীপ্রকৃতির সহজ সুন্দর জীবনকে নিজেদের কবিতায় ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তাঁদের মধ্যে জসিমউদ্‌দীন অন্যতম। গ্রামবাংলার যাবতীয় বিষয়বস্তু বিশেষকরে প্রকৃতি, মানুষ একান্ত সহজভাবে ও ভাষায় তাঁর কবিতায় রূপ পেয়েছে। তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাবলি হল 'রাখালী', 'নকসীকাঁথার সাঠ', 'সোজন বাদিয়ার ঘাট', 'বালুচর', 'মাটির কান্না' ইত্যাদি। আপনাদের পাঠ্য কবিতাটি কবির 'নকসীকাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে।

২.৩.২ সারসংক্ষেপ

কবি বর্তমান কবিতায় রুপাই নামে একটি ছেলের রূপ ও গুণের বর্ণনা দিয়েছেন। পল্লীবাংলার আদর্শ ছেলে সে। কবিতায় তিনটি অংশ আছে। প্রথম অংশে প্রকৃতির নানা উপাদান দিয়ে গড়া রুপাইয়ের দেহের বর্ণনা, দ্বিতীয় অংশে কালো রূপের মহিমা ব্যাখ্যা এবং তৃতীয় অংশে রুপাইয়ের গুণের বিকাশ।

রুপাই গ্রামের এক চাষির ছেলে। মাথায় লম্বা চুল, মুখে শিশুর সারল্য, দেহের রঙ কালো। তার হাত, শরীর ও মুখের হাসি— সর্বত্র প্রকৃতির ছোঁয়া দেখা যায়। দেখতে কালো হলেও , কবি বলছেন কালোই জগতের আলো — রুপাইয়ের কালো বর্ণ দেখে বুক জুড়িয়ে যায় অর্থাৎ মন ভালো লাগে। রুপাইয়ের গায়ে শক্তিও কম নেই। লাঠির খেলায় সে সবার সেরা। খেলার দলে তাকে নেওয়ার জন্য সবার কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আবার গ্রামে যখন জারিগান হয় তখনও রুপাই সবার আগে। গ্রামের সবাই 'বাপের ব্যাটা' রুপাইকে ভালোবাসে, তার গুণগান করে। কবি বলছেন, এককালে এই রুপাইয়ের নামেই সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে।

২.৩.৩ কবিতার বিশ্লেষণ

এই গাঁয়ের ..... কতকটা তার হাসি — গ্রামের এক চাষির ছেলের কথা কবি বলছেন। তার মাথায় আছে লম্বা চুল। গায়ের রঙ কালো। পল্লীকবি জসিম্‌উদদীন প্রকৃতির নানা রঙ, নানা বস্তুর সঙ্গে প্রকৃতি-বালক রুপাইয়ের তুলনা দিয়েছেন। ভ্রমর ফুলে-ফুলে বসে মধু সংগ্রহ করে, ফুলের রঙে সে আকৃষ্ট হয়। কিন্তু রুপাইয়ের কালো রঙের মুখ এতটাই সুন্দর যে ভ্রমর ফুল ভেবে অনায়াসে সেখানে বসতে পারে। শুধু কালোই নয়, সেই মুখ কাঁচা ধানের পাতার মতো সতেজ, সরল আর সেখানে আছে নতুন ওঠা ঘাসের কোমল স্পর্শ। দেখে মায়া হয়। অর্থাৎ সৌন্দর্য, সারল্য আর কোমলতায় ভরা রুপাইয়ের মুখ। চাল কুমড়োর সরু লতানো শাখার সঙ্গে কবি রুপাইয়ের দুই বাহুর তুলনা করেছেন। আর শরীরের বা দেহের তুলনা



তমাল ঃ এটা একটা ফলের গাছ। গ্রাম বাংলায় কালো রঙের তাল ফলকেও তমাল বলে। সাহিত্যে অনেক সময় তাল-তমাল শব্দটি এক সঙ্গেই ব্যবহৃত হয়।

দিয়েছেন শ্রাবণ মাসের বৃষ্টিভেজা কালো ***তমাল*** গাছের সঙ্গে। যেন শরীরটি তার মসৃণ বা তেলচকচকে। বৃষ্টি ধোয়া মেঘে যদি তেল মাখানো হয়, তাহলে যেমন দেখতে হবে— ঠিক তেমনটাই রুপাইয়ের দেহের রূপ। তার এই রূপে মুগ্ধ হয়ে বিজলি বা বিদ্যুৎ যেন লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে। বিদ্যুৎকে কবি এখানে নারী হিসাবে কল্পনা করেছেন। সে তার আলোর খেলাও ভুলে যায় রুপাইয়ের রূপ দেখে— এটাই কবি ভাবছেন। কোনো চাষি হয়তো কচি ধানের চারা তুলতে গিয়ে হেসে ফেলেছেন, কেননা তার স্নিগ্ধ রূপ চাষিকে মুগ্ধ করেছে। রুপাইয়েরও তেমনি একটি স্নিগ্ধ শান্ত রূপ আছে।

কালো চোখের তারা ..... উজল তাহার গাও — কবিতার এই অংশে কবি জগতের সমস্ত কালো রঙের জয়গান করেছেন। তিনি বলছেন — আমরা যে চোখ দিয়ে সমস্ত জগতকে দেখি তার মণির রঙ কালো, কালো রঙের কালি দিয়েই বই ছাপা হয়, আমাদের জন্মও অন্ধকার কালো মাতৃগর্ভে আর মৃত্যুর পর জীবনের আলো নিভে যায়— অনন্ত অন্ধকারে আমরা মিলে যাই — পৃথিবীময় এই কালো রঙ ছড়িয়ে আছে। জীবন ও মৃত্যু— সর্বত্র কালোরই জয়জয়কার। কিন্তু চাষির ছেলে রূপাই যেন এইসব কালোকে জয় করেছে। পৃথিবীর সমস্ত কালোর চেয়ে সে মহান।

কবি বলছেন, সোনা দিয়ে যে সোনার গয়না বানায় তার আবার গর্ব কোথায়? সোনা তো নিজেই উজ্জ্বল, মহার্ঘ। রঙ যদি হাতের কাছে ঠিকঠাক পাওয়া যায় তবে কবির মতো যে কেউ রামধনুকের সাতরঙাহার বানিয়ে ফেলতে পারবেন। অর্থাৎ যা স্বাভাবিক ভাবেই সুন্দর তাকে ব্যবহার করে আরো সুন্দর কিছু তৈরি করা অনেক সহজ। কিন্তু যা স্বাভাবিকভাবে অসুন্দর, কুৎসিত তা-ই যখন সুন্দর হয়ে উঠে সবার মন জয় করে, তখন তার মহিমা অনেক বেশি হয়ে দেখা দেয়। উদাহরণ হিসাবে কবি বৃন্দাবনের শ্রীকৃষ্ণের কালো রঙের কথা ইঙ্গিতে বলেছেন। তিনি রূপে কালো হলেও গুণে অসীম — তাই তাঁর পায়ের ধুলো আশীর্বাদ হিসাবে পাওয়ার জন্য ভক্তের আকুতি তীব্র।



আখ্‌ড়া ঃ গ্রাম বাংলায়, এমনকী শহরাঞ্চলেও শরীর চর্চার জন্য কিছু নির্দিষ্ট জায়গা ছিল। একজন শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে কিশোর ও তরুণ বয়সের ছেলেরা সেখানে ব্যায়ামচর্চা করতেন। সেই সঙ্গে লাঠিখেলা, কুস্তি, মল্লযুদ্ধ, তরোয়াল খেলা ইত্যাদি নানা ধরনের শরীরের চর্চা করত ছেলেরা। এগুলোকেই আখ্‌ড়া বলে। অনেকটা এখনকার 'জিমনাসিয়াম' বা শরীর চর্চার (বডি বিল্ডিং) ক্লাবগুলোর মতো। তবে বৈষ্ণবদের সাধন-ভজনের আশ্রমকেও আখ্‌ড়া বলা হয়।

রুপাইয়ের শরীরে সোনা বা পিতল কোনোটাই নেই যা তাকে ঔজ্জ্বল্য দেবে। তার কালো রঙই এমন স্নিগ্ধ উজ্জ্বল যে তা কবির মনকে শান্তি দেয়, তাঁর বুক জুড়িয়ে যায়। মাঠের ধানে আর গ্রামের শরীরে যে কালোরঙ ছড়িয়ে আছে অর্থাৎ গ্রামের প্রকৃতিতে যত কালো রঙ ছড়িয়ে আছে তাতে স্নান করে বা সিক্ত হয়ে রুপাইয়ের শরীর যেন উজ্জ্বল হয়েছে।

আখ্‌ড়াতে **তার ..... গাঁ হবে নামী**— এই পংক্তিগুলোতে কবি এবার রুপাইয়ের গুণের বর্ণনা ও প্রশংসা করছেন। লাঠিখেলায় রুপাই ওস্তাদ। ***আখ্‌ড়া***তে এ-জন্য তার অনেক সম্মান। সবাই তাকে দলে নিয়ে খেলতে চায়। শুধু তাই নয়, গানেও সে সবার চেয়ে দক্ষ। জারিগান যখন গাওয়া হয় তখন তার গলাই সবচেয়ে বেশি শোনা যায়। গ্রামবাংলার জলাভূমিতে একটু মোটা ও লম্বা আকৃতির বেতগাছ

পাওয়া যায়, যাকে 'শালসুন্দরী' বেত বলা হয়। কবি বলছেন রুপাই যেন সেরকমই। সমস্ত কাজেই ওই বেতের প্রয়োজন হয় — রুপাইও তেমনি সব কাজেই সমান ওস্তাদ। তাকে দেখে গ্রামের বুড়োরা বলেন, রুপাই ছেলে নয়, ও একটা পাগল লোহা— রুপাইয়ের মতো 'বাপের ছেলে' কেউ দেখেছে কখনো— এটা তাঁদের প্রশ্ন। রুপাই রূপা নয়, কিন্তু তার চেয়েও সে মূল্যবান। কবি বলছেন, একদিন ওর নামেই সমস্ত গ্রাম উজ্জ্বল হয়ে উঠবে— ওর নামেই সবাই গ্রামটিকে চিনবে।

২.৩.৪ শব্দার্থ

তৃণ — ঘাস।
ধরা — পৃথিবী।
গাঁও — গ্রাম।
দেছে — দিয়েছে।
জারিগান — এক ধরণের পল্লী-সংগীত
বিজলি — বিদ্যুৎ।
গাও— শরীর।
শাওন — শ্রাবণ মাস।
কেতাব — বই।
পদরজ — পায়ের ধুলো।
সিনান — স্নান।
উজল— উজ্জ্বল, চকচকে।
দ'তের — দোয়াতের।
মানী— মান্য, মাননীয়।
তরু — গাছ।
নবীন — নতুন।
জালি লাউ — কচি চালকুমড়ো।
শোকগীত — কারবালার দুঃখজনক ঘটনা বা গ্রামের কোনো দুঃখজনক ঘটনাকে নিয়ে তৈরি গান।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন —

(ক) জসিমউদ্‌দীন কোথায় জন্মগ্রহণ করেন?

.....

(খ) জসিমউদ্‌দীনের সমস্ত কবিতার মূল বিষয়বস্তু কী?

.....

(গ) 'কালো মুখেই কালো প্রজাপতি/ভ্রমর' — কোনটি শুদ্ধ?

.....

(ঘ) কবি রুপাইয়ের গা-খানিকে কোন তরুর সঙ্গে তুলনা করেছেন?

.....

(ঙ) আলোর খেলা ভুলে কে লজ্জায় লুকিয়ে পড়ে?

.....

(চ) কালো কালি দিয়ে কী কী লেখা হয়?

.....

(ছ) রুপাই কোন ধরনের বেত?

.....

(জ) রুপাই 'পাগল' লোহা না 'তরল' লোহা?

.....

২.৪ পুরনো কাগজের ফিরিওলা — প্রেমেন্দ্র মিত্র

হাঁকে ফিরিওলা— কাগজ-বিক্রি, পুরানো কাগজ চাই।
ঘরের কোণেতে সঞ্চিত যত তাড়াগুলি হাতড়াই।
পুরানো কাগজ চাই !
বহুদিন ধরে জঞ্জাল বাড়ে সের দরে বেচি তাই।
কেমন করিয়া একটি তাহার হঠাৎ নজরে পড়ে;
দেখি সমুদ্রে যাত্রীজাহাজ কোথায় ডুবিল ঝড়ে,
হঠাৎ নজরে পড়ে,
আবার কোথায় মানুষের মাথা বিকায় খুলির দরে।
নিরুদ্দেশ কে সন্তান লাগি ঘোষিছে পুরস্কার;
মৃত্যুঞ্জয় অমৃত কাহারা করিছে আবিষ্কার,
ঘোষিছে পুরস্কার,
পলাতক খুনে লুকায়ে কোথায় চাই যে হদিশ তার।
কোন সে বধূর বুকের আগুন ভিতর করিয়া খাক্,
অবশেষে লাগে বসনে তাহার, পুড়ে গেল সাত-পাক।
ভিতর করিয়া খাক্,
কোন সে গিরির গরল অনলে ঘটিল দুর্বিপাক।

হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের পুরানো কাগজ পড়ি,
আমার নয়নে সহসা পোহায় সে দিনের বিভাবরী।
পুরানো কাগজ পড়ি;
রাখিল ধরণী সে দিনটির পায়ের চিহ্ন ধরি।

সে পদচিহ্ন কোথায় মিলাল তারপরে নাহি খোজ !
মানুষের ঘরে সকলের বড় উৎসব নও-রোজ;
তার পরে নাই খোঁজ;
যাত্রী-জাহাজে ডুবিল যে, বুঝি, তারো ঘরে আজ ভোজ।

রক্তে ছোপানো অশ্রুতে ভেজা পুরাতন যত পাতা,
সব জঞ্জাল আজিকে, হ'লেও রঙীন সূতায় গাঁথা।
পুরাতন যত পাতা,
তাতে কোন দিন কি দাগ লাগিল কে বৃথা ঘামায় মাথা।

হাঁকে ফিরিওলা, কাগজ-বিক্রি, পুরানো কাগজ চাই।
ঘর ভরি যত মিছে জঞ্জাল জমাবার নাহি ঠাঁই।
পুরানো কাগজ চাই;
আদর যাহার ফুরাল, তাহারে সের দরে বেচ ভাই।

২.৪.১ কবি-পরিচয়

১৯০৪ সালে চবিশ পরগণার রাজপুরে (পশ্চিমবঙ্গ) কবি-সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্রের জন্ম হয়। 'কল্লোল' যুগের তিনি অন্যতম আধুনিক কবি। তবে গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন। বাংলায় বিজ্ঞান-ভিত্তিক কাল্পনিক কাহিনি (সায়েন্স ফিকশন) রচনার শুরুটা তিনিই করেন। ছোটদের প্রিয় ঘনাদা চরিত্র সৃষ্টি করে তিনি অমর হয়ে গেছেন। বহু চলচ্চিত্র বা সিনেমাও তিনি করেছেন। তাঁর ছদ্মনাম কৃত্তিবাস ভদ্র। তাঁর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য রচনা হল 'বেনামী বন্দর' (গল্প), 'ফেরারী ফৌজ' (কবিতা), 'পাঁক' (উপন্যাস) ইত্যাদি। 'প্রথমা' তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ।

২.৪.২ সারসংক্ষেপ

এই কবিতায় কাগজ শব্দটির অর্থ সংবাদপত্র। যাঁরা পড়ার জন্য সংবাদপত্র বা খবরের কাগজ বাড়িতে রাখেন তাঁদের কাছে সেগুলো একটা একটা করে প্রতিদিন জমা হয়। পরে সেগুলো পুরনো কাগজ যারা কেনে তাদের কাছে বিক্রি করে দেওয়া হয়। কবির কাছেও এ-ধরনের কাগজ বা সংবাদপত্র জমা হয়ে আছে। যখনই তিনি বাইরে পুরনো কাগজের ফেরিওয়ালার ডাক শুনতে পেলেন তখন ওই কাগজগুলোকে নিয়ে তাঁর একটা বিশেষ অনুভূতির সৃষ্টি হল। সেই অনুভূতি এবং পুরনো কাগজের পরিণতি বিষয়ে মন্তব্য বর্তমান কবিতায় স্থান পেয়েছে।

পুরনো কাগজ জঞ্জালের মতোই। তাই কাগজের ফেরিওয়ালার কাছে সেগুলো বিক্রি করে দেওয়াই রীতি। হঠাৎ হয়তো বা কোনো একটি কাগজ নজরে পড়ে যায়— দেখা যায় পুরনো দিনের নানা খবর। খবরগুলো পড়ে হারানো দিনের কথা আবার মনে পড়ে। জাহাজডুবি, সন্তান-হারানো, বধূমৃত্যু ইত্যাদি নানা খবরেই মন পুরনো দিনে ফিরে যায় কিন্তু ঘটনাগুলোর পরিণতি কী হল তা আর জানা যায়

না। কারো রক্ত বা অশ্রুতে ভেজা খবরগুলো আজ জঞ্জাল, সেগুলোর আর কোনো কদর নেই। তাই খবরের কাগজ ফেরিওয়ালার কাছে সের দরে বেচে দেওয়া হয়।

২.৪.৩ কবিতার বিশ্লেষণ

হাঁকে ফিরিওলা ..... বেচি তাই— ফেরিওয়ালারা রাস্তায় জিনিস বিক্রি করে। কিন্তু কাগজের ফেরিওয়ালারা বাড়ি-বাড়ি গিয়ে পুরনো খবরের কাগজ কেনে। তারা 'পুরনো কাগজ চাই' বলে হাঁক দেয়। তার ডাক শুনে কবি ঘরের কোণে জমানো পুরনো কাগজের গোছা খোঁজেন। অনেক দিন ধরে জমে জমে সেগুলো আবর্জনার মতো হয়ে গেছে। তাই কবি ***সের*** দরে সেগুলো বিক্রি করে দেন ফেরিওয়ালার কাছে।



সের ঃ আগের দিনে ব্যবহৃত ওজন করার সূচক। সাধারণত এটা এক মনের এক ভাগ (১/৪০)। আজকালকার ১ কেজির সামান্য বেশি ওজন।

কেমন করিয়া ..... ঘটিল দুর্বিপাক— পুরনো কাগজগুলো বার করতেই হঠাৎ কয়েকটা খবর কবির নজরে পড়ে। কোথাও ঝড়ে জাহাজডুবি হলো সমুদ্রে বা কোথাও মানুষের মাথা বিক্রি হয়ে যায় সামান্য খুলির দামে। অর্থাৎ অতি সামান্য কারণে মানুষকে মেরে ফেলার খবরও পাওয়া যায়।

কাগজ হারানো ছেলের সন্ধান জানতে চেয়ে কেউ পুরস্কার ঘোষণা করছে, কেউ পলাতক খুনির হদিশ দেবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করছে, আবার মৃত্যুঞ্জয় অমৃত আবিষ্কারের খবরও জানানো হচ্ছে।

কবি বধূহত্যার খবরও পেয়েছেন। বলেছেন, কোনো এক বিবাহিতা স্ত্রী মনের দুঃখে হয়ত গায়ে আগুন দিয়েছেন। ফলে সাতপাকে বাঁধা বিয়ে বা বিবাহিত জীবন তাঁর শেষ হয়ে গেল। একই সঙ্গে কবি পেয়েছেন প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের খবর। পৃথিবীর অভ্যন্তর থেকে কোনো পাহাড়ের মাথা ভেদ করে বেরিয়ে আসে 'গরল অনল' স্বরূপ গলিত লাভা।

অর্থাৎ একটি-দুটি ভালো খবর ছাড়া মানুষের ব্যক্তিগত, সামাজিক বা জাগতিক বিপর্যয়ের নানা খবর কবি পুরনো কাগজের স্তূপ ঘাঁটতে গিয়ে দেখে ফেলেন।

হারানো তারিখ ..... ঘরে আজ ভোজ— পুরনো কাগজ পড়তে পড়তে হারানো দিনগুলো আবার ফিরে আসে। অর্থাৎ মনে পড়ে, পুরনো দিনের বা বিশেষ কোনো তারিখে ঘটে-যাওয়া ঘটনাগুলোর কথা। চোখে হঠাৎ যেন রাতশেষে দিনের আলো ফোটার মতো সেই ঘটনাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠে। পুরনো কাগজই সে-দিনের পদচিহ্ন ধরে রেখেছে— এটা কবি ভাবছেন।

ঘটনাগুলোর ফলশ্রুতি যে কী হল তার কোনো খবর কবির কাছে আর নেই। সেই পদচিহ্ন যে কোথায় হারায় কেউ জানে না। গতিমান সময়ের কাছে সবই বিলীন হয়ে যায়। মানুষ সব ভুলে আবার উৎসবে যোগ দেয়। বৎসর শেষে নতুন

বছরের উৎসবে সবাই মেতে ওঠে। এমনকি জাহাজ ডুবিতে যার বাড়ির লোক ডুবে মরেছে, তার ঘরেও নতুন বছরের উৎসব ***নওরোজ*** পালিত হয়, খাওয়া-দাওয়া হয়। **রক্তে ছোপানো ..... ঘামায় মাথা**— রক্তে রাঙা, চোখের জলে ভেজা নানা ঘটনার বর্ণনাসহ পুরনো কাগজের স্তূপগুলো আজ জঞ্জাল। কিন্তু সেগুলো যেন রঙিন সুতোয় গাঁথা মালার মতো। অর্থাৎ ঘটনাগুলোকে কবি নানা রঙের সুতো দিয়ে গাঁথা একটা মালার মতো দেখছেন। পুরনো ঘটনাগুলোর কী হল বা তাতে কোনো দাগ লাগল কি না— তা নিয়ে কেউ ভাবে না।

হাঁকে ফিরিওলা ..... বেচ' ভাই— কিন্তু যতই পুরনো কথা মনে পড়ুক বা বিপর্যস্ত মানুষগুলোর কী হল তা জানতে ইচ্ছে হোক কবির, পুরনো কাগজ আসলে আবর্জনাই। সেগুলো জমিয়ে রাখার জায়গা ঘরে নেই। পুরনো খবরের কোনো কদর যখন নেই তখন কাগজকে সের দরে বিক্রি করে দেওয়াই উচিত।

কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের জীবনের একটি করুণ অথচ সত্য অনুভবকে ফুটিয়ে তুলেছেন। মানুষের জীবনে গতিই সত্য, আর সব কিছুই মিথ্যে। জীবনে প্রতিদিন কত দুঃখজনক অভিজ্ঞতাই না হয়। তবুও দুঃখের রাত কেটে গিয়ে নতুন ভোর আসে। নতুন দিনে পুরাতনকে ভুলে সবাই উৎসবে মেতে ওঠে। দুঃখে মানুষ বিচলিত হয় ঠিকই, কিন্তু সময়ের পরিবর্তনে তার কথা আর মনে রাখে না। খবরের কাগজ জীবনের সুখ ও দুঃখ— উভয়ের খবরই মানুষের কাছে নিয়ে আসে। কিন্তু দিন গেলে সেই খবরগুলোর সঙ্গে সঙ্গে কাগজের সমাদরও শেষ হয়ে যায়।



নওরোজ ঃ পারসিক মতে নতুন বছরের প্রথম দিন। শব্দটি ফারসি শব্দ। বাংলায় অবশ্যে বর্তমানে এর ব্যবহার প্রায় নেই। বাংলায় পয়লা বৈশাখ বা ইংরেজি মাস হিসাবে নিউ ইয়ারস ডে এখন প্রচলিত।

২.৪.৪ শব্দার্থ

হাঁক— জোরে ডাকা।
তাড়া— গোছা।
সঞ্চিত— জমা করে রাখা।
খাক— ছাই।
ফিরিওলা (ফেরিওয়ালা)— যারা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে জিনিস কেনে বা বিক্রি করে।
খুলি— করোটি, মাথার উপরের অংশ।
জঞ্জাল— আবর্জনা।
বেচি— বিক্রি করি।
বিভাবরী— রাত্রি।
দুর্বিপাক— সংকট।
মৃত্যুঞ্জয়— মৃত্যুকে জয় করছেন যিনি।
হদিশ— (হদিস), সন্ধান।
অনল— আগুন।
ছোপানো— রংকরা, রাঙানো।



অগ্রগতি-নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ২ ঃ নিম্নলিখিত প্রশ্নের সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন —

(ক) প্রেমেন্দ্র মিত্র কবে জন্মগ্রহণ করেন?

.....

(খ) কবির ছদ্মনাম কী?

.....

(গ) প্রেমেন্দ্র মিত্রের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম কী?

.....

(ঘ) কাগজ বলতে এই কবিতায় কী বোঝানো হয়েছে?

.....

(ঙ) 'পুরনো কাগজ চাই' বলে কে হাঁকছে?

.....

(চ) মানুষের মাথা কীভাবে বিকায়?

.....

(ছ) 'খাক' শব্দটির অর্থ কী?

.....

(জ) পুরনো কাগজ পড়ে ধরণী সে দিনের কী ধরে রাখে?

.....

(ঝ) মানুষের ঘরে সবচেয়ে বড় উৎসব কী?

.....

(ঞ) পুরনো খবরের পাতাগুলো কোন সুতোয় গাঁথা?

.....



২.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- আধুনিক যুগে ব্যক্তি মানুষের কথা কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে।
- জসিমউদ্দীনের কবিতায় আছে প্রকৃতি ও মানুষের নিকট সম্পর্কের ছবি।
- একটা পুরনো খবরের কাগজ পুরনো ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন বয়ে নিয়ে আসে, যাকে নিয়ে সংবেদনশীল কবিমন ভাবলেও আধুনিক মানুষ আবর্জনা বলে দূর করে দেয়।
- আধুনিক মানুষ যশকেই প্রাধান্য দেয়, শাশ্বত জীবনধারাকে নয়।
- প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় গভীর জীবনবোধ ব্যক্ত হয়েছে।



২.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) *জসিমউদ্দীনের কবিতা সংকলন।*
২) ত্রিপাঠী, দীপ্তি; *আধুনিক বাংলা কাব্য পরিচয়।*
৩) মিত্র, প্রেমেন্দ্র; *কবিতা সংগ্রহ।*
৪) সিকদার, অশ্রুকুমার; *হাজার বছরের বাংলা কবিতা।*
৫) সিকদার, অশ্রুকুমার; *আধুনিক কবিতার দিগ্বলয়।*
৬) সেনগুপ্ত, অচিন্ত্যকুমার; *কল্লোলযুগ।*

২.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর



১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (ক) বর্তমান বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে।

(খ) প্রকৃতি। (গ) ভ্রমর।
(ঘ) তমাল। (ঙ) বিজলি মেয়ে।
(চ) কেতাব, কোরান। (ছ) শাল-সুন্দী।
(জ) পাগল লোহা।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ (ক) ১৯০৪ সালে।

(খ) কৃত্তিবাস ভদ্র। (গ) প্রথমা।
(ঘ) সংবাদপত্র/খবরের কাগজ। (ঙ) ফেরিওয়ালা।
(চ) খুলির দরে। (ছ) ছাই।
(জ) পায়ের চিহ্ন। (ঝ) নওরোজ।
(ঞ) রঙিন সুতোয়।



২.৮ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ 'রুপাই' কবিতা অবলম্বনে রুপাইয়ের দেহের বর্ণনা দিন। (শব্দসংখ্যা অনধিক ৪০০)

প্রশ্ন ২ ঃ রুপাইকে কেন গ্রামের সবাই ভালোবাসে, কারণগুলো লিপিবদ্ধ করুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ পুরনো কাগজের ফিরিওলার ডাক শুনে কবি কী করেছিলেন? পুরনো কাগজ থেকে কোন্ কোন্ ঘটনার কথা তাঁর নজরে পড়েছিল?

প্রশ্ন ৪ ঃ কবি মানুষের জীবনের একটি করুণ অথচ সত্য অনুভব কীভাবে বর্তমান কবিতায় ফুটিয়ে তুলেছেন তা আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ৫ ঃ ব্যাখ্যা লিখুন (অনধিক ২০০ শব্দের মধ্যে)—

(ক) বাদল-ধোয়া মেঘে কেগো মাখিয়ে দেছে তেল,
বিজ্‌লি-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল।

(ক) যদিও রূপা নয়কো রুপাই— রূপার চেয়ে দামী,
এক কালেতে তরই নামে সব গাঁ হবে নামী।

(গ) হারানো তারিখ ফিরে আসে ফের পুরানো কাগজ পড়ি
আমার নয়নে সহসা পোহায় সে দিনের বিভাবরী

(ঘ) মানুষের ঘরে সকলের বড় উৎসব নওরোজ

*** ***** ***

অধ্যায় ৩ ঃ কবিতা — ৩

অধ্যায় বিন্যাস

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৩.২ পরিচিতি

৩.৩ গানভঙ্গ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৩.৩.১ কবি পরিচয়

৩.৩.২ কবিতার সারাংশ

৩.৩.৩ কবিতার বিশ্লেষণ

৩.৩.৪ শব্দার্থ

৩.৪ অধ্যায় সংক্ষেপ

৩.৫ অতিরিক্ত পঠন

৩.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

৩.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৩.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনারা জানবেন —

- 'গানভঙ্গ' কবিতায় দেখবেন গানের আসরে নবীন গায়কের কাছে প্রবীণ গায়কের পরাজয়ের ছবি।
- 'গানভঙ্গ' কবিতায় জানবেন সংগীত তত্ত্বের মূল কথা।

৩.২ পরিচিতি

কথা কাব্য প্রকাশিত হয় ১৩০৬ বঙ্গাব্দে (১৯০০ খ্রি.)। গ্রন্থটি রবীন্দ্রনাথ উৎসর্গ করেছিলেন প্রিয় বান্ধব জগদীশচন্দ্র বসুকে। *কাহিনী* প্রকাশিত হয় ঐ বচর ১৩০৬ বঙ্গাব্দেই। গ্রন্থটি ত্রিপুরার মহারাজা রাধাকিশোর মানিক্য বাহাদুরকে নিবেদিত। মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যসংগ্রহ (১৩১০ বঙ্গাব্দ) এই শ্রেণির কবিতা দুই অংশে প্রকাশিত হয় *কাহিনী* ও *কথা*। পরে এই দুই অংশের কবিতা ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে *কথা ও কাহিনী* নামে স্বতন্ত্র গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় এবং পরবর্তীকালে সেই নামে প্রচারিত হয়। *কথা ও কাহিনী*র আখ্যানগুলি প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস, গল্পকথা ও আখ্যান অবলম্বনে লিখিত। *কথা* কাব্যে আমাদের অতীত ইতিহাসের অসংখ্য ছোট ছোট আপাত তুচ্ছ ঘটনা ও *কাহিনী*র মধ্যে ত্যাগ, ক্ষমা, বীরধর্ম ও মানব মহত্ত্বের অন্যান্য সব গুণ প্রকাশ পেয়েছে। ভারতবর্ষের প্রাচীন ঐতিহ্য কিশোর বয়স থেকে কবিচিত্তকে আকর্ষণ করেছে। *কথা ও কাহিনী* কাব্যে

দেখা যায়, মহাজীবনের আহ্বান কবির কানে এসে পৌঁচেছে, মানব-মহত্ত্বের গভীর আবেদন তাঁর চিত্তকে স্পর্শ করেছে, শান্ত সমাহিত তপস্যার জীবনের প্রতি তাঁর কবিচিত্ত আকৃষ্ট হয়েছে। একটা নিগূঢ় গভীর চেতনা তাঁর সমগ্র কবি মানসকে রূপান্তরিত করতে চেয়েছে। আলোচ্য কাব্যগ্রন্থের *কাহিনী* অংশের 'গানভঙ্গ' কবিতা আপনাদের পাঠ্য।

৩.৩ গানভঙ্গ — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গাহিছে কাশীনাথ নবীন যুবা,
কণ্ঠে খেলিতেছে সাতটি সুর
শনিত তরবারি গলাটি যেন
কখন কোথা যায় না পাই দিশা,
আপনি গড়ি তোলে বিপদজাল,
সভার লোকে শুনে অবাক মানে,

ধ্বনিতে সভাগৃহ ঢাকি,
সাতটি যেন পোষা পাখি।
নাচিয়া ফিরে দশ দিকে—
বিজুলি-হেন ঝিকিমিকে।
আপনি কাটি দেয় তাহা—
সঘনে বলে 'বাহা বাহা'।

কেবল বুড়া রাজা প্রতাপ রায়
বরজলাল ছাড়া কাহারও গান
বালকবেলা হতে তাহারি গীতে
গেয়েছে আগমনী শরৎপ্রাতে,
হৃদয় উছসিয়া অশ্রুজলে
যখনি মিলিয়াছে বন্ধুজনে
গেয়েছে গোকুলের গোয়াল-গাথা
ঘরেতে বারবার এসেছে কত
পরেছে দাসদাসী লোহিত বাস,
বসেছে নব বর সলাজ মুখে
করিছে পরিহাস কানের কাছে
সামনে বসি তার বরজলাল
সে-সব দিন আর সে-সব গান
সে ছাড়া কারো গান শুনিলে তাই
অতীত প্রাণ যেন মন্ত্রবলে
প্রতাপ রায় তাই দেখিছে শুধু
সুরের পরে সুর ফিরিয়া যায়,

কাঠের মতো বসি আছে,
ভালো না লাগে তার কাছে।
দিল সে এতকাল যাপি—
গেয়েছে বিজয়ার গান—
ভাসিয়া গেছে দুনয়ান।
সভার গৃহ গেছে পুরে,
ভূপালি মূলতানি সুরে।
বিবাহ- উৎসবরাতি,
জ্বলেছে শত শত বাতি—
পরিয়া মণি-আভরণ,
সমবয়সী প্রিয়জন,
ধরেছে শাহানার সুর —
হৃদয়ে আছে পরিপূর
মর্মে গিয়ে নাহি লাগে,
নিমেষে প্রাণে নাহি জাগে।
কাশীর বৃথা মাথা নাড়া —
হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া।

থামিল গান যবে, ক্ষণেক-তরে

বিরাম মাগে কাশীনাথ—

বরজলাল-পানে প্রতাপ রায়
কানের কাছে তার রাখিয়া মুখ
গানের মতো গান শুনায়ে দাও,
এ যেন পাখি লয়ে বিবিধ ছলে
সেকালে গান ছিল, একালে হায়
বরজলাল বুড়া শুক্লকেশ,
বিনতি করি সবে সভার মাঝে
শিরা-বাহির-করা শীর্ণ করে
ধরিল নতশিরে নয়ন মুদি

কাঁপিয়া ক্ষীণ স্বর মরিয়া যায়
ক্ষুদ্র পাখি যথা ঝড়ের মাঝে
বসিয়া বাম পাশে প্রতাপ রায়
'আহাহা, বাহা বাহাঙ্গ' কহিছে কানে,

সভার লোকে সবে অনামনা—
কেহ বা তোলে হাই, কেহ বা ঢোলে,
'ওরে রে আয় লয়ে তামাকু পান'।
সঘনে পাখা নাড়ি কেহ বা বলে,
করিছে আনাগোনা ব্যস্ত লোক,
নীরব ছিল সভা, ক্রমশ সেথা
বুড়ার গান তাহে ডুবিয়া যায়,
কেবল দেখা যায় তানপুরায়
হৃদয়ে যেথা হতে গানের সুর
হেলার কলরব শিলার মতো
কোথায় গান আর কোথায় প্রাণ
তবুও রাখিবারে প্রভুর মান
গানের এক পদ মনের ভ্রমে
আবার তাড়াতাড়ি ফিরিয়া গাহে,
আবার ভুলে যায় পড়ে না মনে,
আবার শুরু হতে ধরিল গান—
দ্বিগুণ থরথরি কঁপিছে হাত,
কণ্ঠ কাঁপিতেছে কাতরে, যেন

হাসিয়া করে আঁখিপাত।
কহিল, 'ওস্তাদজি,
এরে কি গান বলেঙ্গ ছি ঙ্গ
শিকারী বিড়ালের খেলা।
গানের বড়ো অবহেলা।'
শুভ্র উষ্ণীষ শিরে,
আসন নিল ধীরে ধীরে।
তুলিয়া নিল তানপুর,
ইমনকল্যাণ সুর।

বৃহৎ সভাগৃহকোণে,
উড়িতে নারে প্রাণ পণে।
দিতেছে শত উৎসাহ —
'গলা ছাড়িয়া গান গাহ।'

কেহ বা কানাকানি করে,
কেহ বা চলে যায় ঘরে।
ভৃত্যে ডাকি কেহ কয়।
'গরম আজি অতিশয়।'
ক্ষণেক নাহি রহে চুপ।
শব্দ ওঠে শতরূপ।
তুফান-মাঝে ক্ষীণ তরী-
আঙুল কাঁপে থরথরি।
উছসি উঠে নিজসুখে
চাপে সে উৎসের মুখে।
দু দিকে ধায় দুই জনে,
বরজ গায় প্রাণপণে।
হারায়ে গেল কী করিয়া-
লইতে চাহে শুধরিয়া।
শরমে মস্তক নাড়ি
আবার ভুলি দিল ছাড়ি।
স্মরণ করে শুরুদেবে।
বাতাসে দীপ নেবে-নেবে।

গানের পদ তবে ছাড়িয়া দিয়া রাখিল সুরটুকু ধরি—
সহসা হাহারবে উঠিল কাঁদি গাহিতে গিয়া হা-হা করি।
কোথায় দূরে গেল সুরের খেলা, কোথায় তাল গেল ভাসি,
গানের সুতা ছিঁড়ি পড়িল খসি অশ্রুমুকুতার রাশি।
কোলের সখী তানপুরার, পরে রাখিল লজ্জিত মাথা—
ভুলিল শেখা গান, পড়িল মনে বাল্যক্রন্দনগাথা।
নয়ন ছলছল, প্রতাপ রায় কয় বুলায় তার দেহে-
'আইস হেথা হতে আমরা যাই' কহিল সকরুণ স্নেহে।
শতেক-দীপ-জ্বালা নয়ন-ভরা ছাড়ি সে উৎসবঘর
বাহিরে গেল দুটি প্রাচীন সখা ধরিয়া দুঁহু দোঁহা- কর।

বরজ করজোড়ে কহিল, 'প্রভু, মোদের সভা হল ভঙ্গঙ্গ
এখন আসিয়াছে নূতন লোক, ধরায় নব নব রঙ্গঙ্গ
জগতে আমাদের বিজন সভা, কেবল তুমি আর আমি—
সেথায় আনিয়ো না নূতন শ্রোতা মিনতি তব পদে স্বামীঙ্গ
একাকী গায়কের নহে তো গান, মিলিতে হবে দুইজনে—
গাহিবে একজন খুলিয়া গলা, আরেক জন গাবে মনে।
তটের বুকে লাগে জলের ঢেউ তবে সে কলতান উঠে,
বাতাসে বনসভা শিহরি কাঁপে অবে সে মর্মর ফুটে।
জগতে যেথা যত রয়েছে ধ্বনি যুগল মিলিয়াছে আগে-
যেখানে প্রেম নাই, বোবার সভা, সেখানে গান নাহি জাগে।'

৩.৩.১ কবি-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম আপনারা সবাই শুনেছেন। তিনি ১৮৬১ সালে কলকাতার জোড়াসাঁকোতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের সন্তান। তাঁর বাবা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং মা সারদা দেবী। স্কুলের প্রথাগত শিক্ষা গ্রহণ তাঁর সম্পূর্ণ না হলেও বাড়িতে গৃহশিক্ষকের কাছে বিভিন্ন বিষয়ে প্রচুর পড়াশোনা করতেন। ১৮ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি অনেক কবিতা ও গীতিনাট্য রচনা করে ফেলেন। এরপরে তো সারাজীবন ধরে বহু গান, কবিতা, নাটক, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ প্রভৃতি রচনা করেছেন। ১৯৪১ সালে আশি বছর বয়সে শতাব্দীর এই শ্রেষ্ঠ ভারতীয় মনীষী এবং বিশ্বকবির মহাপ্রয়াণ ঘটে।

৩.৩.২ কবিতার সারাংশ

রবীন্দ্রনাথের *কথা ও কাহিনী* কাব্যের 'কাহিনী' অংশের অন্তর্গত 'গানভঙ্গ' কবিতাটির বিষয়বস্তু সংগীতকে অবলম্বন করে গড়ে উঠেছে। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দুটি জীবনের পরস্পর রসময় হয়ে ওঠার সত্য স্বরূপটি উন্মোচন করেছেন। পরিবেশ ও পরিস্থিতি অনুযায়ী গায়ক ও স্রোতা উভয় পক্ষে যদি সঠিক সামঞ্জস্য না হয়, সংগীতের সঙ্গে যদি গায়ক ও স্রোতা উভয়ের প্রাণ সংযোগ না ঘটে; দুই পক্ষের অন্তর যদি সমান তালে দোলা না দেয়-তবে সেই সংগীত চিরন্তন ও সার্থক শিল্প হয়ে উঠতে পারে না। পুরাতন চলে গেলে, নতুনের আগমন বার্তা ধ্বনিত হয়। কিন্তু সবক্ষেত্রেই শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে প্রাণের সংযোগ ও আত্মার মিলনই হচ্ছে সর্বকালের চিরন্তন সত্য। এই দিক দিয়ে পুরাতনের সঙ্গে নতুনেরও সেতু বন্ধন সার্থক হয়ে ওঠে।

রাজা প্রতাপ রায়ের রাজ সভায় কাশীনাথ নামের নতুন গায়কের আগমন হয়। তাঁর গান গাওয়ার ধরণ ও চাল সম্পূর্ণ নতুন। সংগীতের নানা সূক্ষ্ম ক্রিয়া-কলাপে তিনি সভাসদ বর্গকে মুহূর্তে মোহিত ও আকর্ষিত করেন। কিন্তু পুরাতন পন্থী বৃদ্ধরাজার তা পছন্দ হয় না। তিনি তাঁর বাল্যসখা বরজলালের আগমনী-বিজয়ার গান, ভূপালি রাগে, মূলতানি সুরে 'গোকুলের গোয়াল-গাথা' শুনে চির অভ্যস্ত। তাই তিনি সভায় বরজলালকে ডেকে আনলেন। বৃদ্ধ বরজলাল শীর্ণ হস্তে তানপুরা নিয়ে 'ইমন কল্যাণ সুরে' গান ধরলেও তিনি গান গাইতে পারলেন না। কি করে নতুন স্রোতাদের মন আকর্ষণ করতে হয় সেই বিদ্যাও বরজলালের জানা ছিল না। ফলে তাঁর সংগীতের সঙ্গে স্রোতার বন্ধন হল ছিন্ন। তখন সকল সভাসদ বর্গ অসন্তুষ্ট হয়ে উঠলে সভায় কলরবের সূচনা হয়। এইভাবে বরজলালের গানভঙ্গ হয় এবং তিনি লজ্জায় সভাগৃহ থেকে প্রস্থান করেন। ব্যর্থ বরজলাল তখন সংগীতের চিরকালীন সত্যটি উপলব্ধি করেন। তিনি রাজাকে বলেন— "একাকী গায়কের নহেতো গান, মিলিত হবে দুইজনে—" একজন প্রাণখুলে গাইবে এবং আরএকজনা গাইবে মনে মনে। অর্থাৎ গাইয়ের সংগীতের সঙ্গে স্রোতার প্রাণ সংযোগই হচ্ছে সংগীত শিল্পের মূল সত্য। যদি বরজলাল তাঁর সংগীতকে সভাসদ বর্গের প্রাণস্পর্শী করে পরিবেশন করতেন, তাহলে রাজসভায় পুরাতনের সঙ্গে নতুনের মিলন সার্থক হয়ে উঠত। কিন্তু এমনটি হয়নি বলেই সভাগৃহে তাঁর গানভঙ্গ হল। এইভাবে রবীন্দ্রনাথ সংগীত শিল্পের চিরন্তন সত্য স্বরূপটি উদ্‌ঘাটন করেছেন 'গানভঙ্গ' কবিতায়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ *কথা* কাব্যগ্রন্থ কত সালে প্রকাশিত হয়?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ *কাহিনী* কাব্যগ্রন্থটি কবি কাকে নিবেদন করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ *কথা ও কাহিনী* নামে কাব্য গ্রন্থটি প্রথম কোথা থেকে প্রকাশিত হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ *কাহিনী ও কথা* নামে গ্রন্থটি কে প্রকাশ করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ *কাহিনী ও কথা* কাব্যের আখ্যান গুলি কবি কোথা থেকে নিয়েছেন?

.....

৩.৩.৩ কবিতা বিশ্লেষণ

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন মূলত গীতি কবি এবং সেই সঙ্গে একজন সংগীত স্রষ্টা। সংগীতের সঙ্গে তাঁর জীবন ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল। তাঁর মতে যথার্থ সাহিত্য প্রধানত দুটি উপকরণকে অবলম্বন করে আত্মপ্রকাশ করে। এক চিত্র ও দুই সংগীত। চিত্র ভাবকে রূপ দেয়, আর সংগীত সেই ভাবকে সুদূর অসীমে নিয়ে যায়। তাই তাঁর সমগ্র সাহিত্য সৃষ্টিতে বিশেষ করে কাব্যে বিশাল অংশ জুড়ে স্থান লাভ করেছে সংগীত। তাঁর অধিকাংশ কবিতা সংগীত হিসেবে পরিচিত ও সর্বজন সমাদৃত। রবীন্দ্রনাথের রচিত একটি উল্লেখযোগ্য কাব্য গ্রন্থ *কথা ও কাহিনী*। আলোচ্য কাব্যের 'কাহিনী' অংশের অন্তর্গত 'গানভঙ্গ' কবিতাটির বিষয়বস্তু সংগীতকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছে।

'গানভঙ্গ' কবিতাটিতে আপাত দৃষ্টিতে সংগীত কেন্দ্রিক একটি সূক্ষ্ম কাহিনি থাকলেও, গভীর ভাবে নিরীক্ষণ করলে দেখা যায় কবিতাটির মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রনাথ সংগীতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত দুটি জীবনের পরস্পর রসময় হয়ে ওঠার সত্য স্বরূপকে উদ্‌ঘাটন করেছেন। পরিবেশ পরিস্থিতি মিলিয়ে স্রোতা ও গায়ক উভয় পক্ষে যদি দোলা না দেয়, তাহলে তা যথার্থ হয়ে উঠতে পারে না। গায়কের সংগীতের সঙ্গে স্রোতার আবেগ প্রাণ-আত্মা ও ভালোবাসার যথার্থ মিলন না হলে; তা যথার্থ সংগীত হয়ে উঠতে পারে না। পুরাতনের যথার্থ পর নতুনের আগমন ধ্বনিত হয় ঠিকই। কিন্তু সব ক্ষেত্রেই শিল্প সৃষ্টির সঙ্গে প্রাণের যোগই হচ্ছে সর্বকালের চিরন্তন সত্য।

'গানভঙ্গ' কবিতার শুরুতে আমরা প্রত্যক্ষ করি কাশীনাথ নামে এক যুবক রাজা প্রতাপ রায়ের সভাগৃহে গান গাইতে এসেছেন। অপূর্ব কণ্ঠ তাঁর। তাঁর গান শুনে মনে হয়েছে, তিনি যেন পোষ মানা পখির মতো সংগীতের সপ্ত সুরকে নিজ কণ্ঠে বেঁধে রেখেছেন। তরবারির মতো শাণিত তাঁর কণ্ঠস্বর, চঞ্চল হয়ে কখনও দূর- দূরন্তে বিচরণ করেছে, আবার শান্ত সমাহিত হয়ে নিজস্থানে ফিরে এসেছে। এইভবে তিনি গান নিয়ে খেলা করেন। গানের মধ্য দিয়ে কখনও বিপদ জাল গড়ে তোলেন আবার নিজেই

সেই বিপদ জাল ছিন্ন করেন। অর্থাৎ সুরকে স্থায়ী থেকে অন্তরায় নিয়ে সু-উচ্চে চড়িয়ে সকলকে সচকিত করে, আবার মুহূর্তে স্থায়ীর পর্যায়ে নিয়ে এসে সুরের রেশ টানেন। সভাসদেরা অবাক হয়ে তাঁর গান উপভোগ করেন এবং মাঝে মাঝে 'আহাহা, বাহা বাহাঙ্গ' বলে তাঁকে অভ্যর্থনা জানান।

কিন্তু এক সুন্দর সংগীত শোনার পরেও বৃদ্ধ রাজা প্রতাপ রায় কাঠের মতো নিশ্চুপ হয়ে বসে থাকেন। যত ভালো করেই গান করুক, কাশীনাথ, তিনি তাঁকে কোনও মতেই মন থেকে মেনে নিতে পারেন না। প্রতাপ রায়ের কাছে একমাত্র শ্রেষ্ঠ ও আদর্শ গায়ক তাঁর বাল্য সখা বরজলাল। ছোটবেলা থেকেই তিনি বরজলালের গান শুনে অভ্যস্ত হয়েছেন। কখনও আগমনী ও বিজয়া, আবার কখনও বিবাহ-উৎসব আদির গান শুনে তিনি আনন্দ মুখর হয়েছেন, কখনও বিষাদে তাঁর দুচোখ বেয়ে অবিরত অশ্রুধারা ঝরে পড়েছে। এছাড়াও বরজলাল ভূপালি রাগের মধ্য দিয়ে মূলতানি সুরে গেয়ে দিলেন। 'গোকুলের গোয়াল-গাথা'। সেই সব দিন ও সেই সব গান প্রতাপ রায়ের হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে রেখেছে। তাই একমাত্র বরজলালের গান ছাড়া অন্য কারও গান তাঁর মনকে স্পর্শ করেতে অক্ষম। কবির ভাষায় 'হৃদয়ে নাহি পায় সাড়া'। কাশীনাথের সংগীতকে রাজার 'বৃথা মাথা নাড়া'— ছাড়া আর অন্য কিছু বলে মনে হয়না। তাই অনেকক্ষণ ধরে গান করার পর কাশীনাথ একটু বিরতি নিতেই বরজলালের দিকে তাকিয়ে প্রতাপ রায় হেসে বলেন "ওস্তাদজি গানের মতো গান শুনায়ে দাও"। তিনি আরও বলেন— সে কালের মতো এখন আর গান হয় না। একালে গানের বড় অশ্রদ্ধা, লোকেরা গানের অবহেলা করে চলেছে। তিনি সভাসদদের বুঝিয়ে দিতে চান, বরজলালের কাছে কাশীনাথ নিতান্তই নগন্য মাত্র।

রাজার অনুরোধে বৃদ্ধ বরজলাল ধীরে ধীরে সংগীতের আসন গ্রহণ করেন। শীর্ণ হাতে তুলে নেন তানপুরা ও চোখ বন্ধ করে সুর ধরেন 'ইমন কল্যাণ সুর'। কিন্তু বয়সের একটি ধর্ম রয়েছে। বরজলালের ক্ষীণ কন্ঠস্বর শতত কেঁপে কেঁপে ওঠে, নড়ে যায়। কখনও তিনি গানের পদ ভুলে যান, আবার নতুন করে সুর ধরেন। কিন্তু এতে সভাসদরা অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠেন। বরজলাল যেন তাঁদের মনোরঞ্জনে অক্ষম হন। কিন্তু তৎসত্ত্বেও রাজা প্রতাপ রায় বাল্য সখাকে প্রাণপনে উৎসাহ দিয়ে যান এবং বরজলালও বহু কষ্টে তাঁর গানকে অব্যাহত রাখতে চেষ্টা করেন। এদিকে সভাসদরা কেউ 'হাই' তোলেন, কেউ বসে বসে ঘুমে ঘুমে ঢুলতে থাকে। আবার কেউ বা বিরক্ত হয়ে সভা ছেড়ে চলে যান। কেউ পাখা নেড়ে নেড়ে বলেন 'গরম আজি অতিশয়'। এমনকী একে অপরের কানা-কানিও শুরু করেন। বৃদ্ধ রাজা এই সব দেখেও বরজলালকে অনুপ্রেরণা দিয়ে যান। কিন্তু বরজলাল প্রাণপণে চেষ্টা করেও গান গাইতে অক্ষম হন। তাঁর গান ক্ষীণ হয়ে যায়, যেন— "তুফান মানে ক্ষীণ তরী।" তাঁর গানে আর প্রাণ প্রত্যক্ষ হয় না। গান ও প্রাণ বিপরীত মুখী হয়ে ওঠে। তবুও রাজার মান রক্ষার্থে বরজলাল গান

গেয়ে যান। কিন্তু তিনি বারে বারে গানের পদ ভুলে যান, ও গুরুকে স্মরণ করেন। শেষে তিনি গানের পদ ছেড়ে শুধু সুর টুকুই ধরে রাখার চেষ্টা করেন। তারপর একসময় তিনি হাহা করে কেঁদে ওঠেন ও তানপুরা রেখে লজ্জায় মাথা নত করেন। রাজা প্রতাপরায় তাঁর বাল্য সখার ব্যথা বুঝতে পারেন ও দুইজনে সভাগৃহ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। এইভাবে সভায় গানভঙ্গ হয়।

বরজলাল দুঃখের সঙ্গে বলেন তাঁদের সভা এখন ভঙ্গ হয়েছে। নতুন যুগ ও জীবনে এখন তাঁদের আর কোনও প্রয়োজন নেই। তাঁদের বিজন সভায় কেবল তাঁরা দুইজনেই রয়েছেন। বরজলাল প্রতাপ রায়কে অনুরোধ করেন, তাঁদের এই বিজন বেলায় যখন বরজলাল পুনরায় গান ধরবেন তখন যেন তা স্রোতা বিহীন হয়। একই সঙ্গে তিনি একটি চিরন্তন সত্যের উদ্‌ঘাটন করেন যে গান 'একাকী গায়কের' নয়। গানের সঙ্গে স্রোতার মন-প্রাণের একাত্মকরণ চাই। একজন গলা খুলে গাইবে, আর একজন মনে মনে গাইবে। জলের তরঙ্গ তটের বুকে লাগে বলেই কলকল্লোল ওঠে। বনে বনে ডাল-পালা, পাতা-পল্লবে বাতাস লাগে বলেই মর্মর ধ্বনি ওঠে। তাই প্রেম-ভালোবাসা-শ্রদ্ধাও মন-প্রাণ দিয়ে যদি স্রোতা গায়কের গানের সঙ্গে একাত্ম হতে অক্ষম হয় তখনই গান ব্যর্থ হয়। এটাই হল শিল্প সংগীতের মূল কথা। এই পথ পুরাতনের সঙ্গে নতুনের মিলনও সার্থক হয়ে উঠতে পারে। কবিতাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ এই চিরন্তন সত্যের দিকটিকেই উন্মোচন করেছেন। অর্থাৎ পুরাতনের সঙ্গে সর্বদাই নতুনের একটা বিরোধ বা দ্বন্দ্ব রয়েছে। পুরাতন তার স্থান ছেড়ে দেয়, নতুন এসে সেই স্থান দখল করে। কিন্তু দুইয়ের মিলন প্রায়সই সার্থক হয় না। যদি অন্তরের প্রেম-শ্রদ্ধা ভালোবাসা দিয়ে উভয়কে বাঁধা যায়, তাহলে সেই মিলন যথার্থ হয়ে উঠতে পারে। কবিতায় বর্ণিত সভাটিতেও এমন একটি নতুন পুরাতনের মিলন রূপী সুন্দর ছবি ফুটে উঠতে পারত, কিন্তু যেহেনুতু তা হয়নি, তাই শেষে তা 'গানভঙ্গ' সভায় পরিণত হয়েছে।

৩.৩.৪ শব্দার্থ

নবীন	=	নতুন, আধুনিক, তরণ।
যুবা	=	যুবক।
বিজুলি	=	বিদ্যুৎ, তড়িৎ।
লোহিত	=	লাল, রক্তবর্ণ।
নিমেষ	=	পলক, চোখের পাতা ফেলা।
আঁখি	=	চোখ।
উষ্ণীষ	=	পাগড়ি, কিরীট।
কর	=	হস্ত, হাত।

উৎস = যেখান থেকে নিঃসৃত হয়।
কাতর = কষ্টে বা দুঃখে অভিভূত, ব্যাকুল।
সখা = বন্ধু।
কলতান = মধুর ধ্বনি।
যুগল = একজোড়া।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন



প্রশ্ন নং ৬ ঃ 'গানভঙ্গ' কবিতায় নবীন গায়কের নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ কাশীনাথের কণ্ঠের সাত সুরকে কবি কী বলেছেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ কাশীনাথের গানের গলাকে কবি কীসের সঙ্গে তুলনা করেছেন?

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ নবীন গায়কের গানের গতি কেমন?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ 'গানভঙ্গ' কবিতায় উল্লেখিত রাজার নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ কাশীনাথের গান শুনে রাজা কেমন ভাবে বসেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১২ ঃ প্রতাপ রায়ের পছন্দের গায়ক কে?

.....

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ বরজলালের কোন গান রাজার প্রিয়?

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ বরজলাল 'গোকুলের গোয়াল'— গাথা কোন সুরে গাইতেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ বিবাহ অনুষ্ঠানে বরজলাল কী সুরে গান গাইতেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ সভাগৃহে কাশীনাথ গানে বিরাম নিলে, তখন বরজলাল কী সুরে গান ধরেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৭ ঃ বরজলাল প্রভুর মান রাখবার জন্যে কী করেছিলেন?

.....



৩.৪ অধ্যায় সংক্ষেপ

- 'গানভঙ্গ' কবিতাটিতে সংগীত তত্ত্বের মূল কথা প্রাণ বা আত্মার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের কথা জেনেছেন।
- সংগীত গায়ক ও স্রোতা উভয়ের প্রাণ সংযোগেই প্রাণবন্ত হয় এই বিষয়টিকে বুঝেছেন।
- সময় সাপেক্ষে পুরাতনকেও নতুনের উপযোগী হয়ে উঠতে হয়। না হলে নতুন সমাজে তাকে বীতশ্রদ্ধ হতে হয়, তা জেনেছেন।



৩.৫ অতিরিক্ত পঠন

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা।*

২) বিশী, প্রথমনাথ; *রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ* ।

৩) ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ; *রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা।*

৪) মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার; *রবীন্দ্র-পরিক্রমা।*

৩.৬ অগ্রগতি নির্ধয়ক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ১৩০৬ বঙ্গাব্দ।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ত্রিপুরার মহারাজা রাধা কিশোর মণিক্য বাহাদুরকে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মোহিতচন্দ্র সেন।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ইতিহাস, গল্পকথাও আখ্যান থেকে।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাশীনাথ।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সাতটি যেন পোষা পাখি।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শাণিত তরবারি।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিদ্যুৎ সম।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রতাপ রায়।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাঠের মতো।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বরজলাল।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আগমনীও বিজয়ার গান।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ভূপালি মূলতানি সুর।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শাহানার সুর।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ইমনকল্যাণ সুর।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রভুর মান রাখবার জন্যে বরজলাল প্রাণপনে গান গাওযার চেষ্টা করেছিলেন।



৩.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ 'গানভঙ্গ' কবিতার রাজা প্রতাপ রায় ও বরজলালের মধ্যে কথোপকথনের বিবরণ দিন। (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

প্রশ্ন ২ ঃ 'গানভঙ্গ' কবিতার বরজলাল চরিত্রের ট্রাজেডি বিচার করুন। (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

প্রশ্ন ৩ ঃ 'গানভঙ্গ' কবিতার বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করুন। (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

*** ***** ***

অধ্যায় ৪ ঃ কবিতা — ৪

অধ্যায় বিন্যাস

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়
৪.২ পরিচিতি
৪.৩ পুরাতন ভৃত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪.৩.১ কবিতার সার-সংক্ষেপ
৪.৩.২ কবিতা বিশ্লেষণ
৪.৩.৩ শব্দার্থ
৪.৪ অধ্যায় সংক্ষেপ
৪.৫ অতিরিক্ত পঠন
৪.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর
৪.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৪.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনারা জানবেন —

- 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় দেখবেন প্রভু ও ভৃত্যের সুকোমল মানবিক সম্পর্কের ছবি।
- অবহেলিত ভৃত্য কেষ্টার আত্মত্যাগেয় করুণ কাহিনি জানবেন।

৪.২ পরিচিত

মোহিতচন্দ্র সেন সম্পাদিত কাব্যগ্রন্থ (১৩১০) *কথা*-য় কবিতাগুলো দুই অংশে প্রকাশিত হয় — *কাহিনী* ও *কথা*। *কথা*-র প্রথম সংস্করণে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতাটি অন্তর্ভুক্ত হয়। পরে এই দুই অংশের কবিতা নিয়ে ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস থেকে আলাদাভাবে *কথা ও কাহিনী* নামে বই প্রকাশিত হয়। তখন 'পুরাতন ভৃত্য কবিতাটি 'কাহিনী' অংশের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যায়।

৪.৩ পুরাতন ভৃত্য — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভূতের মতন চেহারা যেমন, নির্বোধ অতি ঘোর।
যা-কিছু হারায়, গিন্নি বলেন, 'কেষ্টা বেটাই চোর।'
উঠিতে বসিতে করি বাপান্ত, শুনেও শোনে না কানে।
যত পায় বেত না পায় বেতন, তবু না চেতন মানে।

বড়ো প্রয়োজন, ডাকি প্রাণপণ, চীৎকার করি 'কেষ্টা' —
যত করি তাড়া, নাহি পাই সাড়া, খুঁজে ফিরি সারা দেশটা।
তিনখানা দিলে একখানা রাখে, বাকি কোথা নাহি জানে —
একখানা দিলে নিমেষ ফেলিতে তিনখানা ক'রে আনে।
যেখানে সেখানে দিবসে দুপুরে নিদ্রাটি আছে সাধা—
মহাকলরবে গালি দেই যবে 'পাজি হতভাগা গাধা'—
দরজার পাশে দাঁড়িয়ে সে হাসে, দেখে জ্বলে যায় পিত্তঙ্গ
তবুমায়া তার ত্যাগ করা ভার— বড়ো পুরাতন ভৃত্য।

ঘরের কর্ত্রী রুক্ষমূর্তি বলে, 'আর পারি নাকোঙ্গ
রহিল তোমার এ ঘর দুয়ার, কেষ্টারে লয়ে থাকো।
না মানে শাসন; বসন বাসন অশন আসন যত
কোথায় কী গেলঙ্গ শুধু টাকাগুলো যেতেছে জলের মতো।
গেলে সে বাজার সারা দিনে আর দেখা পাওয়া তার ভার—
করিলে চেষ্টা কেষ্টা ছাড়া কি ভৃত্য মেলে না আর।'
শুনে মহাবেগে ছুটে যাই বেগে, আনি তার টিকি ধরে;
বলি তারে, 'পাজি, বেরো তুই আজই, দূর করে দিনু তোরে।
ধীরে চলে যায়, ভাবি গেল দায়; পরদিনে উঠে দেখি
হুঁকাটি বাড়ায়ে রয়েছে দাঁড়ায়ে বেটা বুদ্ধির ঢেঁকি।
প্রসন্নমুখ, নাহি কোনো দুখ, অতি-অকাত চিত্তঙ্গ
ছাড়লে না ছাড়ে, কী করিব তারে মোর পুরাতন ভৃত্য।
সে বছরে ফাঁকা পেনু কিছু টাকা করিয়া দালালগিরি।
করিলাম মন শ্রীবৃন্দাবন বারেক আসিব ফিরি।
পরিবার তায় সাথে যেতে চায়, বুঝায়ে বলিনু তারে
পতির পুণ্যে, সতীর পুণ্য, নহিলে খরচ বাড়ে।
লয়ে রশারশি করি কষাকষি পোঁটলাপুঁটলি বাঁধি
বলয় বাজায়ে বাক্স সাজায়ে গৃহিণী কহিল কাঁদি,
'পরদেশে গিয়ে কেষ্টারে নিয়ে কষ্ট অনেক পাবে।'
আমি কহিলাম 'আরে রাম রাম। নিবারণ সাথে যাবে।'
রেলগাড়ি ধায়; হেরিলাম হায় নামিয়া বর্ধমানে
কৃষ্ণকান্ত অতি প্রশান্ত তামাক সাজিয়া আনে।
স্পর্ধা তাহার হেনমতে আর কত বা সহিব নিত্যঙ্গ
যত তারে দুষি তবু হনু খুশি হেরি পুরাতন ভৃত্য।

নামিনু শ্রীধামে, দক্ষিণে বামে পিছনে সমুখে যত
লাগিল পাণ্ডা, নিমেষে প্রাণটা করিল কণ্ঠাগত।
জন ছয় সাতে মিলি একসাথে পরমবন্ধুভাবে
করিলাম বাসা, মনে হল আশা আরামে দিবস যাবে।
কোথাব্রজবালাঙ্গকোথা বনমালাঙ্গ কোথা বনমালী হরিঙ্গ
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্তঙ্গ আমি বসন্তে মরি।
বন্ধু যে যত স্বপ্নের মতো বাসা ছেড়ে দিল ভঙ্গ—
আমি একা ঘরে, ব্যাধি-খরশরে ভরিল সকল অঙ্গ।
ডাকি নিশিদিন সকরুণ ক্ষীণ, ‘কেষ্ট, আয় রে কাছে।
এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।’
হেরি তার মুখ ভরে ওঠে বুক, সে যেন পরম বিত্ত।
নিশিদিন ধরে দাঁড়ায়ে শিয়রে মোর পুরাতন ভৃত্য।

মুখে দেয় জল, শুধায় কুশল, শিরে দেয় মোর হাত;
দাঁড়ায় নিঝুম, চোখে নাই ঘুম, মুখে নাই তার ভাত।
বলে বার বার, ‘কর্তা, তোমার কোনো ভয় নাই, শুন,
যাবে দেশে ফিরে, মাঠাকুরানীরে দেখিতে পাইবে পুন।’
লভিয়া আরাম আমি উঠিলাম; তাহারে ধরিল জ্বরে—
নিল সে আমার কালব্যাধিকার আপনার দেহ— ‘পরে।
হায়ে জ্ঞানহীন কাটিল দু’দিন, বন্ধ হইল নাড়ী—
এতবার তারে গেনু ছাড়াবারে, এতদিনে গেল ছাড়ি।
বহুদিন পরে আপনার ঘরে ফিরিনু সারিয়া তীর্থ—
আজ সাতে নেই চিরসাথি সেই মোর পুরাতন ভৃত্য।

৪.৩.১ কবিতার সারাংশ

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ রচিত একটি অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবিতা ‘পুরাতন ভৃত্য’। এই কবিতাটি রবি ঠাকুর রচিত *কথা ও কাহিনী* কাব্যের ‘কাহিনী’ অংশের অন্তর্গত। কবিতাটিতে প্রভু ও ভৃত্যের সুকোমল মানবিক সম্পর্কের ছবি চিত্রিত হয়েছে। কবিতার আরম্ভেই অগোছানো ও আত্মভোলা স্বভাবের এক ভৃত্যের উল্লেখ পাই। যার চেহারা ভূতের মতন। এই ভৃত্যটির নাম কেষ্টা। সে বহুদিন ধরে একই বড়িতে কাজ করছে। তাই তাকে বলা হয় পুরাতন ভৃত্য। কিন্তু বাড়ির গিন্নি এই ভৃত্যকে মোটেও পছন্দ করেন না। এমনকী বড়িতে কিছু হারালে, গিন্নি তার দায় কেষ্টার উপরেই বর্তান।

বড়ির কর্তা তাকে স্নেহ করেন। কিন্তু প্রয়োজনের সময় তাকে প্রাণপনে ডাকলেও পাওয়া যায় না। এমনকী তাকে কিছু রাখতে দিলে, সে ভুলে যায় কোথায় রেখেছে। এরজন্য তাকে বড়ির কর্তা বকলে, সে দরজার পেছনে দাঁড়িয়ে হাসে। তবু বাড়ির কর্তা কেষ্টার মায়া ত্যাগ করতে পারেন না। কিন্তু বড়ির গিন্নি কেষ্টার প্রতি রুক্ষমূর্তি। কারণ কেষ্টাকে কোনও কাজের জন্যে বাজারে পাঠালে, সেদিন আর তার সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। এমনকী সে টাকার হিসাবও ভুল করে। এইজন্য সে বাড়ির কর্তার কাছে বেতন থেকে বেত বেশি পায়। কেষ্টার এইসব দোষের জন্যে বাড়ির গিন্নি, বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার হুমকি পর্যন্ত দিয়েছেন কর্তাকে। তিনি বলেন কেষ্টাকে রেখে কোনও কাজ হয় না, বরং টাকাগুলি জলের মতো খরচ হচ্ছে। তিনি বাড়ির কর্তাকে উপদেশ দেন একটু চেষ্টা করলেই ভালো ভৃত্য খুঁজে পাওয়া যায়। গিন্নির কথায় বাড়ির কর্তা রেগে গিয়ে একদিন কেষ্টাকে ঘর থেকে বের করে দেন। কেষ্টা ধীরে ধীরে চলে গেলে, কর্তা মনে করেন এক গুরুতর দায় ভার থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু কর্তার আচরণে কেষ্টা দুঃখ অনুভব করেন না, বরং প্রসন্নমুখে পরের দিন পুনরায় ফিরে আসে।

একবার বড়ির কর্তা দালালি করে মোটা অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই টাকায় বৃন্দাবন ঘুরতে যান। সঙ্গে নেন কেষ্টাকে। শ্রীধামে গিয়ে কর্তা সাতজন বন্ধুকে নিয়ে একটি বড়িতে বসবাস শুরু করেন। কিন্তু সেখানে তিনি সুখ পাননি। কারণ দুইদিন পর তিনি বসন্ত রোগে আক্রান্ত হল। কর্তার সকল বন্ধুরা চলে গেলেও, কেষ্টা তাঁর সঙ্গ ছাড়েনি। সে পরম স্নেহে দিন-রাত যত্ন করে কর্তাকে সুস্থ করে তোলে। কিন্তু পরবর্তীতে বসন্ত কেষ্টার মাঝে সংক্রামিত হলে, তার অকাল করুণ মৃত্যু হয়। কেষ্টার এই আত্মত্যাগ বড়ির কর্তার অন্তরে তাকে নতুন রূপে ভাস্বর ও জীবন্ত করে তোলে। পরম প্রিয় ভৃত্যকে হারিয়ে নিতান্ত নিঃসঙ্গ কর্তা নিজ গৃহে ফিরে আসেন। কবিতাটিতে প্রভুর প্রতি কেষ্টার এই সুগভীর নিষ্ঠা, আত্মনিবেদন চিরকালীন মানবিক সম্পর্কের সত্য স্বরূপটিকেই উদ্‌ঘাটন করেছে।

৪.৩.২ কবিতা বিশ্লেষণ

কথা ও কাহিনী রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ। এই কাব্যের অন্তর্গত একটি হৃদয়স্পর্শী কবিতা 'পুরাতন ভৃত্য'। কবিতাটিতে রবীন্দ্রনাথ প্রভু ও ভৃত্যের একটি মধুর সম্পর্কের ছবিকে তুলে ধরেছেন। প্রভুর প্রতি পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার আনুগত্য ও নিষ্ঠা এবং ভৃত্যের প্রতি গৃহকর্তার প্রাণভরা ভালোবাসা ও আস্থা কবিতাটিকে এক রসঘন লোকে উত্তীর্ণ করেছে। বড়ির গিন্নি ও কর্তা পুরাতন ভৃত্য কেষ্টাকে যতই বকুক না কেন, সে সেদিকে বিন্দুমাত্র কান না দিয়ে সরল মনে নিজের কর্তব্য পালন করেছে। এমনকী কবিতার শেষাংশে দেখা যায় কেষ্টা তার জীবন দিয়ে প্রভুর প্রতি

শেষ কর্তব্য পালন করেছে। প্রভু ও ভৃত্যের এই মানবিক সম্পর্কের মর্মস্পর্শী করুণ আবেদন কবিতাটিকে চিরকালের সামগ্রী করে তুলেছে।

কবিতার শুরুতেই দেখি বাড়ির কর্তা ভৃত্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। ভৃত্যের রূপটি 'ভূতের মতন' অর্থাৎ সে দেখতে কুৎসিত। সেই সঙ্গে তার বুদ্ধিও কম। বাড়ির গিন্নির বহুদিন ধরে কাজ করে আসা এই ভৃত্যের উপর প্রচণ্ড রাগ। বাড়িতে কোনও কিছু হারালে গিন্নি বলেন "কেষ্টা বেটাই চোর।" বড়ির এই পুরাতন ভৃত্যকে অতি প্রয়োজনের সময় প্রাণ পণে ডাকলেও, তার সারা পাওয়া যায়না। তাকে কিছু রাখতে দিলে, কোথায় রেখেছে সে ভুলে যায়। এমনকী বাজারে গেলে, সারাদিন তাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। টাকার হিসাবও সে গুলিয়ে ফেলে। এই সবের জন্য কর্তার কাছে বেতনের তুলনায় সে বেত বেশি পায়। তবুও কেষ্টার কোনও অনুতাপ বা চেতনা নেই। আসলে কেষ্টা অনেকটা অগোছালো স্বভাবের লোক। তাই তো সে দিনে-দুপুরে যেখানে-সেখানে ঘুমিয়ে পড়ে। এর জন্যে কর্তা 'পাজি হতভাগা গাধা' বলে গালি দিলে, সে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে। কিন্তু এতকিছু সত্ত্বেও বাড়ির কর্তা পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার প্রতি তাঁর মায়া ত্যাগ করতে পারেন না।

তবে বাড়িতে গিন্নি এই ব্যাপারে একেবারে 'রুক্ষমূর্তি'। তিনি কেষ্টার এরূপ আচরণ সহ্য করতে পারেন না। তিনি মাঝেমধ্যে কর্তাকে হুমকি দেন, বাড়ি ছেড়ে চলে যাবেন বলে। তাঁর মতে কেষ্টাকে কাজে রেখে দিনের পর দিন শুধু টাকা গুলি জলের মতো খরচ হচ্ছে। তিনি বাড়ির কর্তাকে উপদেশ দেন কেষ্টাকে ছাড়িয়ে অন্য ভৃত্য রাখতে। তাই বাড়ির কর্তা রেগে গিয়ে গিন্নির মন রক্ষার্থে একদিন কেষ্টার টিকি টেনে ঘর থেকে বের করে দেন। কেষ্টা ধীরে ধীরে সেখান থেকে প্রস্থান করলে বাড়ির কর্তা ভাবেন তিনি গুরুতর দায় ভার থেকে রক্ষা পেয়েছেন। কিন্তু কর্তার এরূপ কার্যে কেষ্টা একটুকুও দুঃখ পায় না; সে প্রসন্নমুখে পরেরদিন পুনরায় বাড়ি ফিরে আসে।

একবার বাড়ির কর্তা দালালি করে মোটা অর্থ উপার্জন করেন এবং সেই অর্থে বৃন্দাবন ঘুরবেন বলে স্থির করেন। এই কথা শুনে গিন্নিও স্বামী সঙ্গিনী হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গিন্নি বৃন্দাবন গেলে অধিক অর্থ খরচ হবে বলে, কর্তা বলেন- "পতির পুণ্যে সতীর পুণ্য" অর্থাৎ স্বামী তীর্থ ভ্রমণ করলে স্ত্রীর আপনা আপনি পুণ্যার্জন হয়ে যায়। গিন্নিকে এইসব বুঝিয়ে, কর্তা কেষ্টাকে নিয়ে তীর্থ যাত্রায় বেরিয়ে পড়েন। শ্রীধাম পৌঁছে কর্তা আরও সাতজন বন্ধুকে নিয়ে একটি বাড়িতে বসবাস শুরু করেন। যদিও তিনি ভেবেছিলেন সেখানে কয়েকদিন খুব আনন্দে কাটাবেন; কিন্তু এই সুখ তাঁর বেশি দিন সইল না। পুণ্য করতে এসে তিনি অনুভব করলেন।

"কোথা ব্রজবালাঙ্গ কোথা বনমালাঙ্গ কোথা বনমালী হরিঙ্গ
কোথা হা হন্ত, চিরবসন্তঙ্গ আমি বসন্তে মরিঙ্গ"

অর্থাৎ বৃন্দাবনে কর্তা মহাশয় বসন্ত রোগে আক্রান্ত হন। যে বন্ধুদের সঙ্গে মিলে কর্তা

আনন্দ করবেন ভেবেছিলেন, তাঁরা সকলে ভয়ে পালিয়েছেন। ব্যাধিগ্রস্থ শরীর নিয়ে কর্তা একা ঘরে মনে মনে ভাবেন— "এত দিনে শেষে আসিয়া বিদেশে প্রাণ বুঝি নাহি বাঁচে।" দিনরাত কর্তা সকরুণ কণ্ঠে 'কেষ্টা'-কে ডেকে চলেছেন। তখন কেষ্টা দিন-রাত কর্তার সেবা করে। কেষ্টাকে দেখে যেন কর্তার বুক ভরে ওঠে। না খেয়ে, না ঘুমিয়ে কেষ্টা এক নাগারে কর্তার সেবা করে, তাঁকে সুস্থ করে তোলেন। কিন্তু দুঃভাগ্যের বিষয় কর্তা সুস্থ হয়ে উঠলে, কেষ্টা স্বয়ং বসন্তে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এরপর দুই দিন অচৈতন্য থাকার পর তার করুণ মৃত্যু ঘটে। পরম প্রিয় ভৃত্যকে হারিয়ে নিতান্ত নিঃসঙ্গ কর্তা স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি উপলব্ধি করেন আজ তাঁর সঙ্গে চিরসাথি পুরাতন ভৃত্য আর নেই।

এইভাবে কবিতার শেষে বাড়ির কর্তা ভৃত্য কেষ্টার আনুগত্য ও পরম ভালোবাসা হৃদয় দিয়ে উপলব্ধি করলেন এবং তাঁর জীবনে কেষ্টার রিক্ততা অনুভব করে বিষাদে ভেঙ্গে পড়েন। একই সঙ্গে কেষ্টাও তার মহান আত্মত্যাগের মধ্য দিয়ে এক সাধারণ ভৃত্য থেকে মহিময় মানুষে উত্তীর্ণ হয়ে সাহিত্যের আসরে উজ্জ্বল ও জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

৪.৩.৩ শব্দার্থ

নির্বোধ	=	বুদ্ধিহীন, মূর্খ।
গিন্নি	=	গৃহিণী, গৃহকত্রী
বাপান্ত	=	পুত্রস্থানীয় ব্যক্তিকে স্নেহসম্বোধন।
চেতন	=	জ্ঞানযুক্ত, সজীব।
কলরব	=	কোলাহল।
নিদ্রা	=	ঘুম, তন্দ্রা।
দিবস	=	দিন।
প্রসন্ন	=	সন্তুষ্ট।
বলয়	=	বালা, কঙ্কণ, বৃত্তাকার অঞ্চল।
প্রশান্ত	=	অতিশয় শান্ত বা স্থির।
ব্যাধি	=	অসুখ।
নিশি	=	রাত্রি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় বর্ণিত ভৃত্যের চেহারা কেমন ?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ কবিতায় উল্লিখিত ভৃত্যের নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ বাড়ির কিছু হারালে গিন্নি কী বলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ গিন্নি ভৃত্যকে গালি দিলে, সে কী করে?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ বাড়ির কর্তা কীসের মায়া ছাড়তে পারেন না?

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ কর্তা কেষ্টাকে বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিলে সে কী করে?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ বাড়ির কর্তা কোথায় তীর্থ করতে যাবেন বলে স্থির করেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ বাড়ির কর্তা গিন্নিকে তীর্থ যাত্রার সময় কেন সঙ্গে নিতে চাননি?

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ বাড়ির কর্তার কী অসুখ হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ কার সেবায় কর্তা সুস্থ হয়ে ওঠেন?

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ কর্তা তীর্থযাত্রা থেকে বড়িতে একা কেন এসেছিলেন?

.....



৪.৪ অধ্যায় সংক্ষেপ

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- প্রভু ও ভৃত্যের মধ্যে মানসিক সম্পর্কের স্ফুরণ হতে দেখেছেন।
- কেষ্টার জীবনের ট্রাজেডিকে প্রত্যক্ষ করছেন।
- হাস্যরসের পরিচয় পেয়েছেন।



৪.৫ অতিরিক্ত পঠন

১) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; *রবীন্দ্র-সৃষ্টি-সমীক্ষা।*

২) বিশী, প্রথমনাথ; *রবীন্দ্র কাব্য প্রবাহ* ।

৩) ভট্টাচার্য, উপেন্দ্রনাথ; *রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা।*

৪) মুখোপাধ্যায়, অরুণ কুমার; *রবীন্দ্র-পরিক্রমা।*



৪.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ভূতের মতন।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কেষ্টা।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'কেষ্টা বেটাই চোর'।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সে দয়জার পাশে দাঁড়িয়ে হাসে।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পুরাতন ভৃত্য কেষ্টার মায়া।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সে পরদিন আবার ফিরে আসে।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৃন্দাবন।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খরচ বেশি হবে বলে।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বসন্ত।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কেষ্টার।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কারণ, কেষ্টা মারা গিয়েছিল।

৪.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার কেষ্টা চরিত্রটি বিশ্লেষণ করুন । (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

প্রশ্ন ২ ঃ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতার মনিব ও ভৃত্যের সম্পর্কটি স্পষ্ট করুন। (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

প্রশ্ন ৩ ঃ 'পুরাতন ভৃত্য' কবিতায় রবীন্দ্রনাথের হাস্যরস সৃষ্টির উদাহরণ দিন। (অনধিক ৩৫০ শব্দে)

*** ***** ***

অধ্যায় ৫ ঃ উপন্যাস - *কপালকুণ্ডলা* — ১

অধ্যায়-বিন্যাস

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৫.২ পরিচিতি

৫.৩ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

৫.৩.১ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা

৫.৩.২ উপন্যাস-পরিচয়

৫.৪ কাহিনিসার

৫.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

৫.৬ অতিরিক্ত পঠন

৫.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

৫.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৫.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি জানতে বা বুঝতে পারবেন—

- সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন ও রচনার কথা জানতে পারবেন
- *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের কাহিনী সম্বন্ধে জানবেন।

৫.২ পরিচিতি

এই অধ্যায়টি বাংলা উপন্যাসের জনক ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের *কপালকুণ্ডলা* নামক বিখ্যাত উপন্যাসের সঙ্গে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দেবে। *কপালকুণ্ডলা* প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে। তখন বাংলা উপন্যাসের প্রথম যুগ এবং বঙ্কিমচন্দ্রের হাত ধরেই বাংলা উপন্যাসের জয়যাত্রা শুরু হয়েছে সবে। কাজেই *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসটির কেন্দ্রীয় ভাববস্তু, ইতিহাসের উপাদান, চরিত্র-বিচার ইত্যাদি বিষয়ে আপনাদের ধারণার সাহায্যের জন্য এখানে যথাসম্ভব আলোচনা করা হবে। এই উপন্যাসের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হল— এর কাহিনি ও ভাষা-বিন্যাস। তাই প্রথমে আপনারা মূল উপন্যাসটি অত্যন্ত মনোযোগ সহ খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ে নেবেন। এরপার আমাদের উল্লেখিত সূচি অনুযায়ী এর বিশ্লেষণের দিকটিতে অগ্রসর হবেন।

৫.৩ ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র

এই অংশে আমরা উপন্যাসকার বঙ্কিমচন্দ্রের বিষয়ে আলোকপাত করব। তবে এই

আলোকপাত স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করা ভালো— বঙ্কিমচন্দ্র ঃ জীবনকথা ও বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস-পরিচিতি। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব বঙ্কিমচন্দ্রের ব্যক্তিজীবন প্রসঙ্গে।

৫.৩.১ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনকথা

১৮৩৮ খ্রিষ্টাব্দের ২৬ জুন (১৩ আষাঢ় ১২৪৫ বঙ্গাব্দ) পশ্চিমবঙ্গের চব্বিশ পরগনা জেলার নৈহাটির কাঁঠালপাড়া গ্রামে বঙ্কিমচন্দ্রের জন্ম হয়। পিতা যাদবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মেদিনীপুরে ডেপুটি কালেক্টর ছিলেন। যাদবচন্দ্রের চার পুত্র; যথাক্রমে— শ্যামাচরণ, সঞ্জীবচন্দ্র ('বঙ্গদর্শন' পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক এবং 'পালামৌ' ইত্যাদি গ্রন্থের রচক), বঙ্কিমচন্দ্র এবং পূর্ণচন্দ্র। ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে ছয় বছর বয়সে মেদিনীপুরে বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষারম্ভ হয়; কেননা পিতা যাদবচন্দ্র তখন ওখানে কর্মরত। মেদিনীপুরে চার বছর পড়াশোনা করে ১৮৪৯-এ তিনি হুগলিতে ভর্তি হন। ওই সময় (১৮৪৯) তাঁর বিয়েও দেওয়া হয়। পাত্রী কাঁঠালপাড়ার নিকটবর্তী নারায়ণপুর গ্রামের পাঁচ বছর বয়সী এক বালিকা। তখনও বাল্যবিবাহের যুগ। কিন্তু বিয়ে করা সত্ত্বেও বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষাজীবন যথারীতি চলতে থাকে। হুগলি কলেজে তিনি ১৮৪৯-এর ২৩ অক্টোবর ভর্তি হন এবং ১৮৫৪ খ্রিষ্টাব্দে জুনিয়র স্কলারশিপ লাভ করেন। পড়ে ১৮৫৬-তে তিনি সিনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষায় সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে বৃত্তি লাভ করেন। ১৮৫৬ খ্রিষ্টাব্দের ১২ জুলাই থেকে ১৮৫৭-র এপ্রিল মাসপর্যন্ত কলকাতায় পড়াশোনা করেন বঙ্কিমচন্দ্র। কলকাতার সুপ্রসিদ্ধ প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে তিনি এন্ট্রান্স ও বিএ পাশ করেন। উল্লেখ্য যে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম প্রথম স্নাতক ছিলেন। ১৮৮৫-তে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজে আইন বিভাগেও ভর্তি হন।

১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দ থেকেই বঙ্কিমচন্দ্রের কর্মজীবনের শুরু। ওই বছর তিনি যশোহরে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ও ডেপুটি কালেক্টরের পদ লাভ করেন। যশোহরে থাকাকালীন তাঁর প্রথম পত্নীর অকাল প্রয়াণ ঘটে। ১৮৬০-এ তিনি মেদিনীপুরের নেগুঁয়া মহকুমার (বর্তমান কাঁথি) বদলি হন। এখানে কর্মরত অবস্থায় হালিশহরের বিখ্যাত চৌধুরী পরিবারের কন্যা রাজলক্ষ্মী দেবীর সঙ্গে তাঁর দ্বিতীয় বিবাহ হয়।

নেগুঁয়া সমুদ্র ও অরণ্যবেষ্টিত জায়গা। এই সমদ্র, তার বালিয়াড়ি ও অরণ্য-প্রকৃতির সান্নিধ্যে আসার ফলেই 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাস লেখা সম্ভব হয়েছিল বলে মনে করা হয়। 'কপালকুণ্ডলা'-র পটভূমি, নদী-তট, নিবিড় অরণ্য, কাপালিক ইত্যাদির সঙ্গে নেগুঁয়ার স্পষ্ট মিল আছে। বঙ্কিমচন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা পূর্ণচন্দ্র জানিয়েছেন, নেগুঁয়ায় থাকাকালীন এক সন্ন্যাসী কাপালিক মাঝেমধ্যে গভীর রাত্রিতে বঙ্কিমচন্দ্রের সঙ্গে দেখা করত।

যা হোক, এরপর তিনি খুলনায় বদলি হন এবং ওখানেই তাঁর প্রথম সার্থক

উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* রচনা শুরু করেন। ১৮৬৪-তে তিনি চল্লিশ পরগণার বারুইপুরে বদলি হন এবং ১৮৬৯ —এই কয়েক বছরের মধ্যেই রচিত হয় তাঁর *কপালকুণ্ডলা* ও *মৃণালিনী* উপন্যাস।

১৮৭২ খিষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে বঙ্কিমচন্দ্র কলকাতার ভবানীপুর অঞ্চল থেকে *বঙ্গদর্শন* পত্রিকা প্রকাশ করেন। এই পত্রিকায় তাঁর *বিষবৃক্ষ, চন্দ্রশেখর, কমলাকান্তের দপ্তর* ইত্যাদি বিখ্যাত সব রচনা প্রকাশিত হয়। এই সময় তিনি বহরমপুরে কর্মরত। ১৮৪৭-এ তিনি বারাণসীতে বদলি হন। এরপর স্বাস্থ্যজনিত কারণে কয়েকমাস অবসর যাপন করেন। *কৃষ্ণকান্তের উইল* এই সময়ের রচনা। ১৮৮০-তে তিনি চুঁচুড়ায় থাকাকালীন *আনন্দমঠ* রচনা করেন।

১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে তিনি ঘোরতর অসুস্থ হন এবং এপ্রিলের ৮ তারিখ তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। মৃত্যুর সময় তাঁর বয়স মাত্র ছাপান্ন বছর হয়েছিল।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ১ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-জীবন কোথায় কীভাবে শুরু হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবন কবে শুরু হয়?

.....

৫.৩.২ উপন্যাস-পরিচিতি

বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম বাল্যরচনা একটি কবিতা। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দের ২৫ ফেব্রুয়ারি *সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায়। এবং ওই বছর ২৩ এপ্রিল তাঁর প্রথম গদ্য রচনা প্রকাশিত হয়। উপন্যাস রচনার ক্ষেত্রে প্রথমে তিনি ইংরেজি ভাষায় রচনা করেন *Raj Mohan's Wife*। এটি তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় ১৯৩৫ খ্রিষ্টাব্দে। কিন্তু তাঁর প্রথম বাংলা উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* প্রকাশিত হবার পর বাংলা সাহিত্যে তুমুল আলোড়ন সৃষ্টি হয়। এর ভাষা, কাহিনি, বুনন, ঘটনা-বিন্যাস, চরিত্র চিত্রায়ন ইত্যাদি সমেত এটি সমগ্র বাংলা সাহিত্যে এক অভিনব সংযোজন রূপে চিহ্নিত হয়। বঙ্কিমের দ্বিতীয় উপন্যাস *কপালকুণ্ডলা*। এখানেও বঙ্কিম-প্রতিভা চূড়ান্ত রূপে বিকশিত হয়েছে।

আমরা এখানে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসসমূহের একটি তালিকা তুলে ধরলাম। তালিকাটি কালানুক্রমিক প্রকাশকালসহ প্রদত্ত হল— *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫),

কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬), *মৃণালিনী* (১৮৬৯), *বিষবৃক্ষ* (১৮৭৩), *ইন্দিরা* (১৮৭৩), *যুগলাঙ্গুরীয়* (১৮৭৪), *চন্দ্রশেখর* (১৮৭৫), *রজনী* (১৮৭৭), *কৃষ্ণকান্তের উইল* (১৮৭৮), *রাজসিংহ* (১৮৮২), *আনন্দমঠ* (১৮৮২), *দেবী চৌধুরাণী* (১৮৮৪), *রাধারাণী* (১৮৮৬), *সীতারাম* (১৮৮৭)।

এই অধ্যায়ে আমরা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের সম্যক পরিচয় ও উপন্যাসটির উৎস সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা করব। এই আলোচনা থেকে উপন্যাসটির বিষয়, ঘটনা ও নেপথ্য-কাহিনি সম্পর্কে অবহিত হওয়া যাবে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৩ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের প্রথম উপন্যাসের নাম কী? এটি কবে প্রকাশিত হয়?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ *কপালকুণ্ডলা* কবে প্রকাশিত হয়?

.....



আপনাদের করণীয় — ৫.১

(ক) বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন-কথা সংক্ষিপ্ত আকারে তুলে ধরুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

(খ) বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের সূচনা ও বিবর্তন বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন এবং প্রসঙ্গত *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের স্থান নির্ধারণ করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

৫.৪ কাহিনিসার

গঙ্গাসাগরে স্নান সেরে মাঘ মাসের শেষ রাত্রিতে একটি যাত্রীবাহী নৌকা ফিরছিল। বঙ্কিমের ভাষায়— কাহিনি প্রায় দুইশ পঞ্চাশ বছর আগের। চারদিক কুয়াশায় পূর্ণ। মাঝিরা দিক নির্ণয় করতে পারেনি। তাই নৌকা স্রোতের টানে কোন দিকে যাচ্ছে— বোঝেনি তারা। প্রবল স্রোতের টানে যদি মহাসমুদ্রে গিয়ে পড়ে তাহলে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। যাত্রীরা সকলেই উৎকণ্ঠিত। একমাত্র নবকুমার বলে এক যুবক যাত্রী নিরুদ্বেগ। তাঁর মৃত্যুভয় নেই। সকলকে তিনিই সাহস দিচ্ছিলেন। এদিকে ভোর হয়েছে। আচমকা রোদ উঠেছে। রোদের কিরণে কুয়াশা কেটে গেল। দেখা গেল তারা রসুলপুরের মোহনায় এসে উপস্থিত হয়েছে। একদিকে পার দেখা যায়, অন্যদিকে পার নেই— শুধু জলরেখা। আর এগিয়ে যাওয়ার দরকার নেই ভেবে মাঝিরা কাছাকাছি নদীতীরে

নৌকা বাঁধল। যাত্রীরাও স্নানাহারের উদ্যোগ গ্রহণ করল। রান্নাবান্নার জন্য কাঠ চাই। নৌকায় জ্বালানি কাঠ নেই। সামনের বন থেকে আনতে হবে। কিন্তু বাঘের ভয়ে কেউই সেখানে যেতে রাজি নয়। অবশেষে নবকুমার নামক সেই সাহসী যুবাযাত্রী একাই কুঠার হাতে নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে জঙ্গলের দিকে গেলেন। এদিকে জোয়ার এল। যাত্রীরা নবকুমারকে ফেলেই স্রোতের অনুকূলে নৌকা ছেড়ে দিল। অনেক যাত্রী ভাবলেন হয়তো নবকুমার বাঘের পেটেই গেছে।

এদিকে নবকুমার ফিরে এসে দেখলেন যে নৌকা তাঁকে রেখেই চলে গেছে। হতাশ নবকুমার এদিকে-ওদিকে নৌকাটির খোঁজে কিছুক্ষণ ছোটাছুটি করে মানসিকভাবে ভেঙে পড়লেন। বহু সময় ধরে তিনি তীরে হাঁটলেন। অবশেষে সেই জনমানবশূন্য বালিয়াড়িতে ক্ষুধায়-তৃষ্ণায় অবসন্ন হয়ে পড়ে রইলেন। ক্লান্তিতে তিনি ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম যখন ভাঙল তখন রাত হয়ে গেছে। চারদিকে অন্ধকারের নিশ্ছিদ্র কালো অবগুণ্ঠন। হঠাৎ নবকুমারের চোখে পড়ল— দূরে একটি অস্পষ্ট আলোকবিন্দু। নবকুমার আলোর সন্ধান পেয়ে মানুষ আছে ভেবে সেদিকে এগিয়ে গেলেন। ক্রমে আলোর কাছাকাছি এসে দেখলেন— একটি ধুনি জ্বালিয়ে এক ভীষণদর্শন কাপালিক ধ্যানমগ্ন। কাপালিকের ধ্যান ভাঙল। নবকুমারের কথা থেকে কাপালিক বুঝলেন— পথিক ক্ষুধার্থ এবং ব্রাহ্মণ। যা হোক, সে-রাত্রির মতো আশ্রয় পেয়ে নবকুমার কাপালিকের কেয়াপাতার কুটিরেই কাটালেন। পরদিন নবকুমারের সন্দেহ হল যে কাপালিকের উদ্দেশ্য অন্য। নবকুমার কাপালিককে দেখতে পেলেন না। এদিকে ওদিকে ঘোরাঘুরির সময় দেখলেন বনমধ্যে এক অপূর্ব সুন্দরী রমণী। যুবতী তাঁকে জিজ্ঞাসা করল— 'পথিক, তুমি কি পথ হারিয়েছ?' যুবতী তাঁকে কুটিরে পৌঁছে দিল। নবকুমার সেদিনের মতো ওইখানেই রাত্রি যাপন করলেন। তারপরের দিনও কেটে গেল। রাত্রে কাপালিক নবকুমারকে সঙ্গে নিয়ে জঙ্গলের পথে চলল। আগে কাপালিক, পেছনে নবকুমার। ঘন জঙ্গলের মধ্যে আচমকা নবকুমারের কানে ভেসে এল এক নারীকণ্ঠ— 'পথিক, পালাও— তুমি কি জানো না, নরমাংস না-হলে তান্ত্রিকের পূজা হয় না।' কাপালিকও বুঝলেন— নবকুমার তাঁর আসল উদ্দেশ্য জেনে গেছেন। কাপালিক তাই বলশালী হাতে নবকুমারের হাত চেপে ধরে পূজাস্থানে নিয়ে এলেন এবং তাঁকে বনের লতাপাতা দিয়ে শক্ত করে বেঁধে ফেলে রাখলেন। নবকুমারের মনের অবস্থা তখন শোচনীয়। তিনি যখন বুঝলেন— বলের দিক দিয়ে তিনি শক্তিশালী কাপালিকের কাছে পরাজিত এবং তার কবল থেকে মুক্ত হতে পারবেন না— তখন তাঁর জন্মভূমি, পরিবার-পরিজন —সকলের মুখ মনে পড়ল। অসহায় নবকুমারের চোখ দিয়ে আসন্ন মৃত্যুর কথা ভেবে দু-ফোঁটা জল গড়িয়ে শুকনো বালিতে পড়ে মিশে গেল। এদিকে পূজা শেষ করে কাপালিক যখন খড়্গ নিতে গেল, তখন দেখল খড়্গ নেই। খড়্গটা কাপালিকের পালিতা সেই যুবতী কপালকুণ্ডলা সরিয়েছিল। কপালিক খড়্গের খোঁজে এদিকে-ওদিকে যেতেই কপালকুণ্ডলা লতা কেটে নবকুমারকে মুক্ত করে তাঁকে নিয়ে বনের ভেতর দিয়ে নিরাপদ স্থানের দিকে ছুটল। নবকুমারও নেই, কপালকুণ্ডলাও নেই— কাপালিক পাগলের মতো ছুটতে ছুটতে একটা উঁচু বালির ঢিবিতে উঠে তাকাতে গিয়ে টাল সামলাতে না-পেরে ওখান থেকে গড়িয়ে নীচে পড়ল এবং বালিচাপা পড়ে আহত হল।

এদিকে কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে নিয়ে রাত্রির দ্বিতীয় প্রহরে বহুদূরে এক কালীমন্দিরে এসে উপস্থিত হল। মন্দিরের অধিকারী সব শুনে বুঝলেন— কপালকুণ্ডলা ও নবকুমার উভয়েই বিপন্ন। এদের বাঁচানোর জন্য তিনি নবকুমারের সঙ্গে কপালকুণ্ডলার বিয়ে দিলেন দেবী মা-কে সাক্ষী রেখে।

নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে নবকুমার স্বদেশের দিকে রওয়ানা দিলেন। তাঁর বাড়ি নবগ্রাম। পথে যেতে যেতে এক পান্থশালায় মতিবিবির সঙ্গে দেখা। নবকুমার বুঝতেই পারলেন না, এই মতিবিবি তাঁরই প্রথমা স্ত্রী পদ্মাবতী। তিনি শুধু জানলেন, মতিবিবি বর্ধমানে যাচ্ছে। কপালকুণ্ডলাকে দেখে মতিবিবির রূপের গর্ব ভেঙে গেল। নিজের মূল্যবান গয়নাগুলো সে কপালকুণ্ডলাকে পরিয়ে দিল। কপালকুণ্ডলা আশৈশব বনে পালিতা। অলংকারের লোভ তার ছিল না। সে অবাক হয়ে গেল। সে জানতেও পারল না যে মতিবিবি তারই সতিন। আসলে, মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীর নবকুমারের প্রতি তীব্র আকর্ষণ তখনও জাগ্রত ছিল। নবকুমারকে সে ভোলেনি। ঘটনাচক্রে সে মুসলমান হয়েছিল এবং আগ্রার মোগল হারেম পর্যন্ত তার যাতায়াত গড়ে উঠেছিল।

যা হোক, কপালকুণ্ডলা তো সমাজ-পরিবার, স্বামী-সংসার —জীবনের এই দিকগুলো কিছুই জানে না। সে পথে মতিবিবি অলংকারগুলো ভিক্ষুককেই দিয়ে দিল। সপ্তগ্রামে নিজ গৃহে আসার নবকুমারকে ফিরে পেয়ে তাঁর মা আনন্দে আত্মহারা হলেন। তাঁরা তো পুত্রের আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন। এদিকে পুত্রের সঙ্গে নতুন পুত্রবধূকে পেয়েও তাঁরা অবাক। কপালকুণ্ডলা বধূরূপে সংসারে প্রবেশ করলেন। নবকুমারের বোন শ্যামাসুন্দরীর বয়সও কপালকুণ্ডলারই মতো। সে কপালকুণ্ডলাকে সাজিয়ে-পরিয়ে সমাজ-সংসারে আরও নিয়ে আসতে চাইল। কিন্তু কপালকুণ্ডলার ভাবাবেগ নেই। তার মনে তখনও সেই বনের আরণ্যক আদিম জীবন জাগরূক। কপালকুণ্ডলার নতুন নাম হল 'মৃন্ময়ী'। কপালকুণ্ডলার মনের কোনো পরিবর্তন হল না দেখে শ্যামাসুন্দরী তার কারণ জানতে চাইল। শুনল, বিয়ের সময়— শিবলিঙ্গে বিল্বপত্র দিয়েছিল কপালকুণ্ডলা— কিন্তু তা পড়ে যায়। অতএব, কপালকুণ্ডলার বিশ্বাস— এই বিয়ে সুখের হবে না।

এদিকে মতিবিবি বর্ধমানে উপস্থিত হল। সে মোগল যুবরাজ সেলিমের প্রতি প্রণয়াসক্ত। অথচ সেলিম মেহেরুন্নিসার প্রতি আকৃষ্ট। এই কথা মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী জানত। তাই তার বর্ধমানে আগমন। ভারতের সম্রাজ্ঞী কে হবে— সেই সংশয় হাতেকলমে সে নিরসন করতে চায়। মেহের ও মতি সখী। কথাবার্তা থেকে বোঝা গেল মেহের বিবাহিতা হলেও সেলিমের প্রতি অনুরাগিণী। সেলিমকে জানাল তার পূর্ব স্বামী নবকুমারকে সে ফিরে পেতে চায়। সেলিম অনুমতি দিলেন। আগ্রায় মতিবিবিকে সবাই জানত লুৎফউন্নিসা নামে। সেই পরিচয় থেকে ফিরে এল সে। নয়া রূপে, নয়া বেশে। তার স্বামীগৃহ নবগ্রামে এসে উপস্থিত হল মতিবিবি বা পদ্মাবতী। নবকুমারকে সে চায়। যে-কোনো ভাবে। ধনের গর্ব, রূপের গর্ব সে ত্যাগ করে এসেছে শুধু নবকুমারের জন্য। কিন্তু নবকুমার কঠোর; নীতিবাদী। মতিবিবি পরস্ত্রী। তাছাড়া ঘরে ধর্মপত্নী 'মৃন্ময়ী' ওরফে কপালকুণ্ডলা।

নবকুমারকে তাই মতিবিবি কোনো প্রকারেই বশ করতে পারল না। তখন মতিবিবি নিজের পরিচয় তুলে ধরল। সে পদ্মাবতী, যবনী নয়। নবকুমারের সঙ্গে তার একদা বিবাহ হয়েছিল। তার পিতা মোঘল দরবারে নিজের আধিপত্য ও প্রতিষ্ঠা বিস্তারের লক্ষ্যে ইসলাম কবুল করে মুসলমান হন। এবং সেই থেকেই পদ্মাবতী 'মতিবিবি'-তে পরিণত। নিজের রূপ ও ব্যক্তিত্বে মতিবিবি আগ্রায় ক্ষমতা ও ঐশ্বর্য ভোগ করেছিল। জীবনে সে যা চেয়েছে তা পেয়েছে বলতে গেলে। কিন্তু কোথাও যেন একটা নিঃসঙ্গতা, অপ্রাপ্তির বেদনা কাজ করছিল। তাই নবকুমারকে আবার ফিরে পেতে সে মরিয়া হয়ে উঠেছিল। অথচ সেই নবকুমার তাকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন।

নবকুমারের প্রত্যাখ্যানকে সহজে নিতে পারল না পদ্মাবতী। যার জন্য নবকুমার তাকে প্রত্যাখ্যান করলেন— সেই কপালকুণ্ডলাকেই নবকুমারের জীবন থেকে সরিয়ে দেবার পরিকল্পনা করল। এখানে তার ঈর্ষা প্রকট হল। এদিকে প্রতিঘাতের আশায় ভগ্নস্বাস্থ্য সেই কাপালিক নবকুমারের বাড়ির পেছন দিকের জঙ্গলে আস্তানা গেড়েছিল। কাপালিককে ওখানে দেখেই মতিবিবি বুঝল— কাপালিক কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ করতে সচেষ্ট। দুইয়ে দুইয়ে চার। কাপালিক ও মতিবিবি উভয়েই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। এদিকে, ননদ শ্যামাসুন্দরীর স্বামী তাকে ভালোবাসত না। তার জন্য বশীকরণ ঔষধ আনতে কপালকুণ্ডলাও বনের মধ্যে প্রবেশ করল। এবং সেখানেই পুরুষবেশী মতিবিবিকে সে দেখতে পায়। পরে কাপালিক ও মতিবিবির কথাবার্তা আড়াল থেকে শুনে সে বুঝল মৃত্যু তার দ্বারে উপস্থিত। অন্যদিকে, কাপালিকের কৌশলে নবকুমার পত্নীকে সন্দেহ করেন। অনুযোগ করেন— কপালকুণ্ডলা সাংসারিক জ্ঞানহারা। কাপালিক নবকুমারকে মাদক সেবন করায়। নবকুমারের উত্তেজিত প্রশ্নেও কপালকুণ্ডলা স্থির, অচঞ্চল। ভবিতব্যকে মেনে নেওয়া ছাড়া তার কোনো গতি থাকে না। সে জলে পড়ে যায়। নবকুমার তাকে বাঁচাতে নিজেও ঝাঁপ দেন। কাউকেই আর পাওয়া যায়নি।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৫ ঃ কাপালিকের কবলে নবকুমারের যে-ভয়ানক অবস্থা হয়েছিল সে কোথায় এবং কেন?

.....



আপনাদের করণীয়— ৫.২

মতিবিবির কথা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে কোন্ প্রসঙ্গে যুক্ত হয়েছে আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)



৫.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই অধ্যায়টিতে আমরা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী সম্পর্কে অবহিত হলেন।
- বঙ্কিম তাঁর সাহিত্য-জীবনে কোথায়, কোন্ প্রসঙ্গে *কপালকুণ্ডলা* নামক অভূতপূর্ব উপন্যাসটি রচনার প্রেরণা পেয়েছিলেন — তা জানলেন।
- *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি সম্বন্ধেও জানলেন।



৫.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) বাগচী, শশাঙ্কশেখর (সম্পাঃ); *কপালকুণ্ডলা।*
২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।*
৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ; *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।*
৪) ভট্টাচার্য, অরূপকুমার; *উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র।*
৫) সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র; *বঙ্কিমচন্দ্র।*

৫.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের শিক্ষা-জীবন শুরু হয় ছয় বছর বয়সে ১৮৪৪ খ্রিষ্টাব্দে; মেদিনীপুরে। ওখানে চার বছর অধ্যয়ন করে তিনি ১৮৪৯-এ হুগলিতে ভর্তি হন।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বঙ্কিমচন্দ্র চাকরিসূত্রে খুলনায় থাকাকালীন তাঁর উপন্যাস রচনার শুরু। প্রথম উপন্যাস *দুর্গেশনন্দিনী* (১৮৬৫)। *তবে সংবাদ প্রভাকর* পত্রিকায় তাঁর বাল্যরচনা প্রকাশিত হয় ১৮৫২ খ্রিষ্টাব্দে।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বঙ্কিমের প্রথম উপন্যাসের নাম *দুর্গেশনন্দিনী*। এটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৫ খ্রিষ্টাব্দে।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসটি প্রকাশিত হয় ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাপালিকের কবলে নবকুমার বঙ্গোপসাগরের মোহনায় এক সমুদ্র-সৈকতে

পড়েছিলেন। কাপালিক তাঁকে ভবানীর পূজায় বলি দিতে চেয়েছিল। কেননা তার বিশ্বাস ভবানীই নবকুমারকে তার কাছে পাঠিয়েছেন। আর মনুষ্য বলির মধ্যে দিয়ে সে পরম শক্তির অধিকারী হবে।



৫.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের জীবন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ২ ঃ বঙ্কিমচন্দ্রের সাহিত্য-জীবনের ক্রমবিকাশ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের উৎস ও বিষয়-বৈচিত্র্য সম্পর্কে আলোচনা প্রস্তুত করুন।

*** ***** ***

অধ্যায় ৬ ঃ উপন্যাস - *কপালকুণ্ডলা* — ২

অধ্যায়-বিন্যাস

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৬.২ পরিচিতি

৬.৩ চরিত্র-বিচার

- ৬.৩.১ নবকুমার
- ৬.৩.২ কপালকুণ্ডলা
- ৬.৩.৩ মতিবিবি বা লুৎফউন্নিসা
- ৬.৩.৪ কাপালিক

৬.৪ অলৌকিকতা

৬.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

৬.৬ অতিরিক্ত পঠন

৬.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

৬.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৬.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি জানতে বা বুঝতে পারবেন—

- নায়িকা কপালকুণ্ডলা ও নায়ক নবকুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য
- কাপালিক চরিত্রের ভয়ঙ্কর দিক; তার প্রতিশোধস্পৃহা
- মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতীর প্রেম, প্রবৃত্তি, উচ্চাকাঙ্ক্ষা
- আরণ্য জীবনের সংস্কার ও সামাজিক জীবনের জটিলতা এই উপন্যাসে যে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছে, তার তাৎপর্য।

৬.২ পরিচিতি

এর আগের অধ্যায়টিতে আপনারা বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনী, তাঁর সাহিত্য-জীবন এবং তাঁর উপন্যাসের ধারাবাহিক পরিচয় সম্পর্কে সম্যক অবহিত হয়েছেন। তার সঙ্গে আলোচ্য *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত কাহিনি, বিষয়-বৈচিত্র্য প্রসঙ্গও জেনেছেন। উপন্যাসটিতে ইতিহাসের উপাদান কীভাবে যুক্ত হয়ে নতুন মাত্রা এনে দিয়েছে — তাও আলোচিত হয়েছে। তা ছাড় বনচর জীবন ও সামাজিক-পারিবারিক জীবনের সংঘাতের বিষয়েও আপনারা অবহিত হয়েছেন।

এই অধ্যায়ে আপনারা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের মূল চারটি চরিত্র সম্পর্কে জানতে পারবেন। পাশাপাশি উপন্যাসটিতে অলৌকিকতার প্রসঙ্গ কীভাবে এসেছে — তাও আলোচিত হবে।

৬.৩ চরিত্র-বিচার

আসুন, এবার আমরা *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসের কয়েকটি প্রতিনিধি স্থানীয় চরিত্র নিয়ে আলোচনা করি। এই উপন্যাসে যেসব চরিত্র মুখ্য, তারা হল— নবকুমার, কপালকুণ্ডলা, মতিবিবি এবং কাপালিক। তা ছাড়া কয়েকটি গৌণ চরিত্র রয়েছে, যেমন— অধিকারী, শ্যামাসুন্দরী, পেষমন, সেলিম ইত্যাদি। প্রথমেই মুখ্য চরিত্রের বিষয়ে সম্যক আলোচনা করছি আমরা।

৬.৩.১ নবকুমার

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়ক নবকুমার, এ নিয়ে কোনো আপত্তি বা বিচার বিশ্লেষণ থাকতে পারে না। উপন্যাসের মুখ্য চরিত্রও তিনিই। তাঁরই জীবনের ভাগ্য-বিড়ম্বিত ইতিহাস এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে শুরু থেকে। এবং এই ঘটনার সঙ্গে কপালকুণ্ডলা নামক বনচর এক যুবতীর সংযোগ ঘটেছে। আর শেষমেশ সেই বনচর যুবতীর কথাই সমধিক প্রাধান্য পেয়েছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও নবকুমার উপন্যাসে এক অনিবার্য বিন্দু রূপে প্রতিভাত। তাঁর ও কপালকুণ্ডলার শোচনীয় পরিণতির মধ্য দিয়েই উপন্যাসের সমাপ্তি। প্রধান পুরুষ চরিত্র হিসাবে এই উপন্যাসের নায়কও তিনিই।

নবকুমারের ব্যক্তি পরিচয় সেকালে সামাজিক অবস্থান থেকে বিচার্য। তিনি ব্রাহ্মণ তনয়। নিবাস সপ্তগ্রাম। উপন্যাসের মধ্যবর্তী অংশ থেকে জানা যায়— একদা তাঁর বিয়েও হয়েছিল। প্রথমা স্ত্রী তাঁকে ত্যাগ করেছিল। আমাদের মনে হয় এইসব কারণে নবকুমার অনেকাংশে উদাসীন, আবেগতাড়িত ও সংসারের প্রতি খানিকটা বিমুখ। সহজভাবে তিনি গৃহস্থ। বাড়িতে মা এবং বোন শ্যামাসুন্দরী। 'ইষ্টকনির্মিত' গৃহ তাঁর। মোটামুটি সচ্ছলই। কিন্তু কোথাও যেন তিনি অতৃপ্ত। তাই পুণ্য-অর্জন উপলক্ষে ও দেশভ্রমণের জন্য তিনি গঙ্গাসাগর পাড়ি দিয়েছিলেন গ্রামের আর দশজনের সঙ্গে। তবে তাঁর এই যাত্রার মূলে আরেকটি কারণ হল— সমুদ্র দর্শন। অর্থাৎ নবকুমার সৌন্দর্য-বিলাসী বা সৌন্দর্য-পিয়াসী। পুণ্যঅর্জন বাহ্যত বটে, কিন্তু তা উপলক্ষ মাত্র। সমুদ্র দেখার উচ্ছ্বাসে তিনি সংস্কৃত কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে তাঁর মধ্যে এক রোমান্টিক মেজাজের মানুষ দেখা যায়। এই রোমান্টিকতার মধ্যে আবেগের প্রাধান্য থাকায় তাঁর চরিত্রে বাস্তববুদ্ধির অভাবও দেখা গেছে।

উপন্যাসের শুরুতে নবকুমারকে কিছুটা সক্রিয় দেখা গেলেও পরে তাঁকে অনেকাংশে নিষ্ক্রিয় দেখা যায়। উপন্যাসের প্রথম দৃশ্যেই তাঁকে উদার, পরোপকারী ও

নির্ভীক যুবক রূপে দেখতে পাই। বিপদে সকলকে ধৈর্য ধরে অপেক্ষার করার আশ্বাসবাণীও শোনা যায় তাঁরই মুখে। গঙ্গাসাগরে যখন তীর্থ যাত্রীরা অকূল জলরাশির মধ্যে আতঙ্কিত— তখন তিনিই একমাত্র অবিচল। বরং মাঝিদের নৌকা চালনা বন্ধ করার নির্দেশ তিনিই দেন, বলেন— প্রভাত হচ্ছে, কয়েক দণ্ডের মধ্যেই সূর্য উঠবে এবং গন্তব্য স্থির করা যাবে। এই ধীর ও স্থির আচরণ প্রথম থেকেই নবকুমারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। নৌকা তীরে পৌঁছুলে ক্ষুধার্ত যাত্রীদের রান্নার জন্য কাঠ আনার কেউ নেই। সেইখানেও এই নবকুমার। অকুতোভয়। নদীতীরে বনমধ্যে কাঠ সংগ্রহ করতে বিলম্ব হল। কাঠের বোজাও কম নয়। নৌকা থেকে দূরত্বও অনেকখানি। ইতিমধ্যে জোয়ার এল। স্বার্থপর সহযাত্রীরা নবকুমারকে বিজন সৈকতে একাকী ফেলে নৌকা নিয়ে চলে গেল। এবং পরিত্যক্ত নবকুমারের ভাগ্য বিড়ম্বনাও তখন থেকেই শুরু। মানুষের উপকার করা ও সহৃদয়তাই তাঁর কাল হল। বস্তুত, নবকুমার সরল, কিন্তু বিচক্ষণ নন। নইলে একা বাঘ ও কুমিরে ভরা নদীসৈকতে কাঠ সংগ্রহ করার ঝুঁকি নিতেন না। সহযাত্রীরা তাঁকে ফেলে যাবে— এ-কথা তিনি যেন বিশ্বাসই করতে পারেননি। সারল্যই তাঁর সম্পদ, আবার সারল্যই তাঁর বিপদ।

যা হোক, বনমধ্যে, জনমানবশূন্য সমুদ্রতীরে ঘন জঙ্গলে প্রাথমিক ধাক্কা সামলে নিয়ে তিনি খানিকটা মেনেই নিয়েছেন প্রতিকূলতাকে। তাঁর সরল অন্তঃকরণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হলেও পরিস্থিতিকে মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনো কথা ভাবতে পারেনি। তাঁর সরল হৃদয় কাপালিককেও বিশ্বাস করেছে। বিশ্বাস করেছে কপালকুণ্ডলাকেও। ওই সারল্যই তাঁকে নরঘাতক কাপালিকের আশ্রয়ে এনে ফেলেছে। একবারের জন্য মনে কোনো শঙ্কা জাগেনি। বরং সমুদ্রের অসীম নীল শোভা তাঁকে গভীর আনন্দ ও প্রশান্তি এনে দিয়েছে। সমুদ্রের অফুরন্ত অনির্বচনীয় রূপের মধ্যে রোমান্টিক নবকুমার আত্মহারা হয়েছেন। সচরাচর ক্ষেত্রে এরকম বিপদের মধ্যে সৌন্দর্যবোধ জাগার কথা নয়। কিন্তু নবকুমার ব্যতিক্রম। তাঁর এই ভাবুক দৃষ্টির সামনে তাই অকস্মাৎ এক অদ্ভুত অভূতপূর্ব ঘটনা ঘটেছে। সেটি বঙ্কিমের ভাষায়—

> গাত্রোত্থান করিয়া সমুদ্রের দিকে পশ্চাৎ ফিরিলেন। ফিরিবামাত্র দেখিলেন, অপূর্ব মূর্তি ! সেই গম্ভীরনাদী বারিধিতীরে, সৈকতভূমে অস্পষ্ট সন্ধ্যালোকে দাঁড়াইয়া অপূর্ব রমণী মূর্তি ! কেশভার— অবেণীসংবন্ধ, সংসর্পিত, রাশিকৃত, আগুল্‌ফ-লম্বিত কেশভার; তদগ্রে দেহরত্ন, যেন চিত্রপটের উপর চিত্র দেখা যাইতেছে।

এই যে ঘটনা, সেটি যেন কবির ভাষায়— 'হঠাৎ আলোর ঝলকানি লেগে ঝলমল করে চিত্ত'। সেই আলোর ঝলকানি নবকুমারের জীবনে কপালকুণ্ডলা। কপালকুণ্ডলা সুমিষ্ট বাক্য 'পথিক, তুমি পথ হারাইয়াছ?' সারা উপন্যাসেই যেন ঝংকৃত হয়ে উঠেছে। বস্তুত, নবকুমার এক পথহারা নায়ক রূপে গণ্য। সৌন্দর্যপিয়াসী তাঁর মন

তখন কেবল ভেবেছে—'সাগরবসনা পৃথিবী সুন্দরী; রমণী সুন্দরী; ধ্বনিও সুন্দর; হৃদয়তন্ত্রীমধ্যে সৌন্দর্যের লয় মিশিতে লাগিল।' তাঁর মনে হয়েছে— এ দেবী, না মানবী, না কাপালিকের মায়া মাত্র!

এর পরের ঘটনা *কপালকুণ্ডলা*র পাঠক মাত্রই জানা। কপালকুণ্ডলার রূপে মোহিত বিভোর নবকুমার বাস্তবকে আবারও ভুলে গেছেন। তাঁর এই বিস্মৃতি তাঁকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। 'নরমাংস না-হলে কাপালিকের পূজা হয় না' — এই বহু প্রচলিত কথাটিও কপালকুণ্ডলা তাঁকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন। এসব কথা তাঁর মনেই আসেনি। চরম বিপদেও তিনি নির্বিকারই ছিলেন প্রথমে। সমুদ্র ও নারীর রূপ এরকম প্রতিকূল পরিবেশেও তাঁকে বশ করেছে।

যা হোক, কাপালিকের হাত থেকে কপালকুণ্ডলার সহযোগে তিনি রক্ষা পেয়ে সেই রাত্রিতেই অধিকারী মশাইর অনুরোধে কপালকুণ্ডলাকে বিবাহ করেন। এটুকু পর্যন্ত নবকুমার চরিত্রের প্রথম পর্যায়। কপালকুণ্ডলার জীবনই উপন্যাসের মুখ্য উপজীব্য ধরলে— কপালকুণ্ডলার জীবনের প্রথমাংশকে অধিকতর গুরুত্ব দিতে নবকুমারের আগমন ঘটিয়েছেন বঙ্কিম। এর পরের পর্বে নবকুমার নিষ্ক্রিয় ও নিষ্প্রভ। কেননা সেখানে কপালকুণ্ডলাই মুখ্য।

এবারে প্রত্যাবর্তন। নববধূকে নিয়ে দেশে ফেরা। নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী থেকেও যখন নেই— তখন গভীর শূন্যতা নিয়ে তাঁর দিন কেটেছে। ভাবালু চরিত্র দেখে সেটা অনুমান করা যায়। কিন্তু অকস্মাৎ কপালকুণ্ডলার সঙ্গে সাক্ষাৎ ও তাকে বিয়ে করা— এই ঘটনা নবকুমারের জীবনে নতুন তরঙ্গাভিঘাত তুলেছে। প্রাণরক্ষাকারিণীকে বিয়ে করার জন্য সব ত্যাগই করার সংকল্প মনে এসেছে। পথে কপালকুণ্ডলার জন্য অর্থব্যয় করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি।

কিন্তু বিধি! সেই বিধি তাঁকে তাঁর পূর্ব স্ত্রী পদ্মাবতীর সঙ্গে পথে সাক্ষাৎ করিয়েছে। দীর্ঘদিন পর কন্দর্পকান্তি স্বামীকে পেয়ে পদ্মাবতী ওরফে মতিবিবির প্রবৃত্তি জেগেছে দুরকমে। প্রথমত, ভোগ-বিলাস ঐশ্বর্যে সে তৃপ্ত নয় এবং নারীর ঘর-বাঁধার স্বপ্নটি তাকে এখনও আলোড়িত করছে। এবং দুই, নববিবাহিতা স্ত্রী সহ তাঁরই পূর্ব স্বামীর সম্ভাব্য মুখটিও যেন ঈর্ষা ও লোভের সামনে দ্বিগুণভাবে প্রকট হয়েছে।

কপালকুণ্ডলা নবকুমারের পারিবারিক জীবনে মৃন্ময়ী হিসাবে নতুন করে জীবন শুরু করেছে। রূপমুগ্ধ কৃতজ্ঞ নবকুমার তাতেই খুশি। তাঁর মা ও বোন তাঁকে ফিরে পেয়েছেন। সঙ্গে আবার নতুন বউ। সব মিলিয়ে একটি আনন্দঘন নিস্তরঙ্গ জীবনের সন্ধান মেলে এ-সময়। কপালকুণ্ডলার রূপ ও শান্ত-স্নিগ্ধ দিকটি নিয়েই তিনি সুখী। যেজন্য পদ্মাবতী তার রূপ-যৌবন, ধন-ঐশ্বর্য নিয়ে নবকুমারকে ফিরে পেতে চাইলেও নবকুমার তাঁকে শূন্য হাতে ফিরিয়ে দিয়েছেন।

আর এখানেই উপন্যাসের মোড়। প্রত্যাখ্যাত ভুজঙ্গী মতিবিবি নবকুমারের সুখের সংসারে কৌশলে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। নবকুমারের দৃষ্টিতে তাকে অবিশ্বাসী করে তুলেছে। এদিকে কপালকুণ্ডলাও কেমন যেন উদাসীন। আজন্ম বন-জীবনে লালিত-পালিত হওয়ার তার সত্তায় মানবিক চাহিদাগুলির বিকাশ ঘটেনি। সেদিক থেকে নবকুমার দাম্পত্য জীবনে অসুখীই বলতে হবে। কিন্তু তাঁর চরিত্রের দুর্বলতা তাঁকে সন্দেহপ্রবণ করে তুলিছে। পূর্বাপর বিচার-বিবেচনার অবকাশ দেয়নি। নবকুমার চরিত্রের এই হটকারী আচরণ গঙ্গাসাগর ভ্রমণকালেও দেখেছি আমরা। কাজেই কপালকুণ্ডলাকে তিনি সন্দেহের আগুনে ফেলেছেন। এবং সেই আগুনে নিজেও পুড়েছেন, তাকেও পুড়িয়েছেন।

নবকুমার এক বিচিত্র চরিত্র। সৎ, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী, ভাবুক ও উদাসীন। অন্যদিকে অবিবেচক, হটকারী, দূরদৃষ্টিহীন এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল। সব মিলিয়ে এই হল নবকুমার চরিত্র। তবে নায়িকাপ্রধান উপন্যাস হিসাবে 'কপালকুণ্ডলা'-তে নবকুমার যতটা প্রয়োজন ঠিক ততটাই যেন পরিস্ফুট। বাংলা উপন্যাসে নবকুমার এক ভাগ্যবিড়ম্বিত অনন্যসাধারণ চরিত্র —তাতে সন্দেহ নেই।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ১ ঃ নবকুমার চরিত্রের মধ্যে কী কী বৈশিষ্ট্য রয়েছে?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ নবকুমারের জীবনে কোন্ দুটি দিক তাঁর চরিত্রকে নিয়ন্ত্রণ করেছে?

.....

৬.৩.২ কপালকুণ্ডলা

এবারে আলোচনা করা যাক উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলাকে নিয়ে। নাম থেকেই প্রকট যে কপালকুণ্ডলা এই উপন্যাসের নায়িকা। তার জীবনই এখানে প্রতিপাদ্য বিষয়। স্বাভাবিকভাবে বঙ্কিম প্রথম থেকে তাকে এই অভূতপূর্ব চরিত্র রূপে বাংলা সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা করেছেন। শৈশবে আরণ্যক প্রকৃতির মধ্যে বড় হয়ে উঠলে— সংসার জীবনে তার প্রভাব কেমন করে কীভাবে পড়বে —এই কথা বঙ্কিমকে ভাবিয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্রের জীবনীতে সেই তথ্য মেলে। কাজেই কপালকুণ্ডলা চরিত্রটি যে সর্বার্থে ব্যতিক্রমী —সে-বিষয়ে সংশয় নেই।

উপন্যাসে যখন কপালকুণ্ডলার সঙ্গে আমাদের দেখা হয়, তখন সে তরুণী বা বলা যেতে পারে বিবাহ-উপযুক্ত। কিন্তু তার আগের জীবনের একটি ছোট্ট রেখাও পাওয়া যায়। জলদস্যুদের দ্বারা সে ছোটবেলা অপহৃত হয়ে সাগরতীরে পরিত্যক্ত হয়।

কাপালিক তাকে কুড়িয়ে পেয়ে লালন করে। প্রকৃতির মধ্যেই তার শৈশব তথা বড় হয়ে ওঠা। এমন প্রকৃতি যেখানে মানুষের কোনো আনাগোনা নেই। কাজেই কপালকুণ্ডলা আশৈশব মানুষ-বঞ্চিত জীবনেই অভ্যস্ত। সে শুধু দুজন মানুষকে চিনত। এক, কাপালিক। এবং দুই, অধিকারী। কাপালিক তাকে কী উদ্দেশ্য নিয়ে লালন-পালন করেছিল— তাও খুব স্পষ্ট। উদ্দেশ্য — সাধনপথে তাকে ব্যবহার। কাপালিক তাকে কী দৃষ্টিতে দেখত তাও কিন্তু বোঝা যায় না। কেননা কাপালিক কপালকুণ্ডলার জীবনের সর্বনাশের নিমিত্তই সপ্তগ্রামে এসেছিল এবং মতিবিবির সান্নিধ্যে সেই কাজ অনেকাংশে সফল করেও তুলেছিল। অতএব, বোঝা যায়— লালন-পালন ছাড়া কপালকুণ্ডলার সঙ্গে তার কোনো মানবিক বোধের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। দ্বিতীয়ত, কাপালিকের কর্মকাণ্ডও কপালকুণ্ডলা সুনজরে দেখেনি। নবকুমারকে বলি দেওয়ার চেষ্টা ঘটনাটি সম্ভবত প্রথম নয়। কপালকুণ্ডলা শৈশব থেকে কাপালিকের এই তথাকথিত ধর্মীয় রক্তলোলুপ চরিত্র দেখেই বড় হয়েছে। ফলে কাপালিকের সঙ্গে তার আবেগিক সম্পর্ক নিবিড় ছিল না বললেও অত্যুক্তি হয় না। বরং অধিকারী মশাইকে সে পিতৃতুল্য নির্ভরযোগ্য শুভানুধ্যায়ী রূপে বিবেচনা করেছে। তাঁর কাছ থেকে যৎসামান্য শিক্ষাও সে পেয়েছে। অধিকারীর নির্দেশে অজ্ঞাতকুলশীল নবকুমারকে বিয়ে করে নতুন জীবনের পথে পা বাড়িয়েছে।

কপালকুণ্ডলার জীবনকেও স্পষ্টত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়। এক, বিবাহ পূর্ববর্তী। এবং দুই, বিবাহ পরবর্তী। বিবাহ পূর্ববর্তী স্তরের কিছুটা আমরা অলোচনা করেছি ইতিমধ্যে। তবে তার সঙ্গে আরও কয়েকটি কথা মনে রাখতে হবে। আশৈশব প্রকৃতির মধ্যে প্রায় মনুষ্যসংসর্গ ছাড়া বড় হওয়ায় কপালকুণ্ডলার স্বভাব-প্রকৃতিও সেরকমই হয়ে উঠেছে। অরণ্য ও সমুদ্রের যুগলবন্দি তার আচরণের মধ্যে যেন ধরা পড়েছে। চপল হরিণীর মতো তার প্রায় নিঃশব্দ পথচলা। স্তব্ধ অরণ্যের মতো সে মিতবাক আবার সমুদ্রের মতো সে গম্ভীর। তার ভাষা ও আচরণ তাই গাম্ভীর্য ও সংযমের দ্বারা আবৃত কাপালিকের প্রভাবে তার মধ্যে দৈবী শক্তি, বিশেষত শাক্ত বিশ্বাস প্রবল ছিল। আবার অধিকারীর সাহচর্য তাকে উদার ও মধুর দেবীপূজার সংস্কার দিয়েছিল। দেবীর উদ্দেশে নিবেদিত বিল্বপত্র পতিত হওয়া দেখে সে ভবিতব্য মেনে নেওয়ার সংকল্প করেছে। বলেছে—'যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে, তাহাই ঘটিবে। ...মা ত্রিপত্র ধারণ করিলেন না —অতএব কপালে...'

কপালকুণ্ডলা এক অদ্ভুত জীবন নিয়ে বড় হয়েছে। পূর্বোক্ত দুই ব্যক্তি ছাড়া আর কাউকে সে দেখেইনি। কাজেই নারী-পুরুষ ভেদাভেদটি পর্যন্ত তার বোধে তেমন প্রকট ছিল না। এর প্রমাণ পাই নবকুমারকে দেখার পর তার অভিব্যক্তি দেখে। অপরিচিত যুবাপুরুষকে দেখে তরুণী-মনে যে-সংকোচ বা সলজ্জ ভাব অথবা প্রগল্‌ভতা — কোনো কিছুই কপালকুণ্ডলার আচরণে দেখা যায়নি। পলকহীন আয়তনয়নে শুধু তার

জিজ্ঞাসা— 'পথিক, তুমি কি পথ হারাইয়াছ?' কাপালিক নবকুমারকে বলি দেবে— এই সম্ভাবনা দেখে সে নবকুমারকে মুক্ত করেছে, একসঙ্গে পলায়ন করেছে। কিন্তু এর অন্তরালে শুধু তার অরণ্য-প্রকৃতিজাত সারল্যই প্রকট, অন্য কিছু নয়। অধিকারীর কাছে নবকুমারকে পৌঁছে দিয়ে নিজে সে কাপালিকের কাছে ফিরে যেতে চেয়েছে। এবং এই ফিরে যাওয়ার পরিণতিও সে জানে। তবু সে নির্বিকার। কেননা কপালকুণ্ডলা আত্ম-উদাসীন।

বিয়ে হল। বিয়ে কী — তাও সে জানে না। অধিকারীর মুখে যখন সে শুনল বিবাহই নারীর ধর্মের সোপান— জগন্মাতা ভবানীও শিবের গৃহিণী— তখন সে নির্লিপ্ত কণ্ঠে বলেছে— 'তাহাই হোক।' নবকুমারের প্রতি কোনো আকর্ষণ থেকে সে এই বিয়েতে রাজি হয়নি, হয়েছে পরিস্থিতি ও কর্তব্যের তাগিদে। পারিবারিক-সামাজিক পরিবেশ সে পায়নি। পায়নি তার সংস্কার, শিক্ষা ও সভ্যতা। কপালকুণ্ডলাও তাই সামাজিক-পারিবারিক সংস্কারশূন্যা। ভালো-মন্দ, অগ্র-পশ্চাৎ ক্ষতি-বৃদ্ধি বিবেচনা তার নেই। মতিবিবি যখন পথে তাকে গয়না দান করে— সে অনায়াসে সেই গয়না ভিখিরির হাতে তুলে দেয়।

কপালকুণ্ডলার জীবনের দ্বিতীয় পর্বের সূচনা স্বামীগৃহে বধূরূপে। এখানে তার নাম হয়েছে 'মৃন্ময়ী', সম্বোধনে 'মৃনো'। দাম্পত্য জীবন শুরু, পারিবারিক নীতি-প্রথার গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ সে, অথচ তবুও যেন সে সেই বনের পাখি। এলোচুল বেঁধে গৃহবধূ হতে তার কোনো আগ্রহ নেই। স্বামী-সংসার-পরিবার-পরিজন, পোশাক-আশাক-অলংকার, সাজ-সজ্জা কিছুই তাকে সুখ দিতে পারে না। তাই কোনো দিনই সে যে সুখী হতে পারবে না— এরকম একটা বদ্ধমূল ধারণা ও সংস্কারও তার মধ্যে ক্রিয়া করেছে।

ইতিমধ্যে একটি বৎসর কেটে গেছে। কপালকুণ্ডলার 'মৃন্ময়ী' রূপে কিছুটা পরিবর্তন ঘটেছে। সাজগোজেও খানিকটা বধূভাব এসেছে। কিন্তু সংস্কার আর যায় না। শ্যামাসুন্দরীর স্বামীকে বশ করার জন্য সে রাত্রিবেলা পার্শ্ববর্তী জঙ্গলে একাই গিয়ে ঢুকেছে। ননদকে বলেছে— 'শুনেছ ত, রাত্রে বেড়ান আমার ছেলেবেলা হইতে অভ্যাস।' গৃহস্থের বউ-ঝি রাত্রে বেড়ানো ঠিক নয়— তার পক্ষে একা নিশীথে বাইরে যাওয়া চারিত্রিক ত্রুটির নামান্তর— এসব কথা শুনেও সে ভালোমন্দের পরোয়া করেনি। বরং বলেছে— 'যদি জানিতাম যে স্ত্রীলোকের বিবাহ দাসীত্ব, তবে কদাপি বিবাহ করিতাম না।'

এবং স্বামীকে সরাসরি উদ্দেশ্য বলেই সে রাত্রিবেলা ঘর থেকে ওষুধের সন্ধানে বেরিয়ে গেছে। লোকে মন্দ বলে বলুক, তার কোনো আসে যায় না।

গৃহপার্শ্বে বনভূমিতে গিয়ে তার সেই ফেলে আসা মুক্ত অবাধ জীবনের আনন্দময় সুখস্মৃতি মনে পড়েছে। প্রাণভরে শ্বাস নিয়েছে। সমুদ্রতীরের অরণ্য-জীবনকে ভুলতে পারেনি। সংসারের প্রতি তার তীব্র অনীহা। লৌকিক জীবন তাকে বাঁধতে

পারেনি। তার মধ্যে বনচর জীবনের মুক্ত স্বভাবই ক্রিয়াশীল। ব্রাহ্মণবেশীর সঙ্গে আঁধার রাতে দেখা করার ক্ষেত্রেও তাই সে ভয়শূন্যা, সংকোচশূন্যা। একমাত্র ভৈরবী-ভবানীকেই সে মেনেছে। স্বপ্নবৃত্তান্তকে তাই মেনে নিয়েছে।

ব্রাহ্মণবেশী মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী যখন তাকে স্বামীত্যাগের পরামর্শ দিয়েছে — তখনও সে উদাসীন। নবকুমার তার মনে এই আছে, এই নেই। স্বামীত্যাগের কুমন্ত্রণা তাকে পীড়িত করেনি। অর্থাৎ আরণ্যক জীবন কপালকুণ্ডলাকে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে রেখেছে। সেখান থেকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে সে অবশেষে মুক্তি লাভ করেছে। স্বামী নবকুমার তার কাছে সুখ-দুঃখের সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে ওঠেননি— কেননা, তার দৃষ্টিতে তিনি শুধু ব্রাহ্মণকুমার। নারীসুলভ প্রণয় বৃত্তিও তার মধ্যে ছিল না। ছিল না ঘর-বাঁধা, স্বামী-পুত্রের আকাঙ্ক্ষা। পার্থিব জীবনের প্রতি কোনো আকর্ষণই তার মধ্যে দেখা যায়নি।

'প্রেতভূমে' নাম শেষ অধ্যায়ে নবকুমার কম্পিত, কিন্তু কপালকুণ্ডলা নির্ভীক, নির্বিকার, নিষ্কম্প। স্বামী তাকে চরিত্রহীনা ভেবেছেন, পালক-পিতা তাকে বধ করতে এসেছে। কাজেই আর বাকি কী রইল। জীবনে সুখ-আহ্লাদ কিছুই ছিল না। ছিল সামান্য একটু বন্ধন। সেই বন্ধন ছিন্ন করে মৃত্যুর মধ্যে শান্তিলাভ করতে চেয়েছে কপালকুণ্ডলা। এবং তা হয়েওছে। বন-জীবন ও সংসার-জীবনের দ্বন্দ্ব ও দোদুল্যমান চিত্ত অবশেষে নিষ্কৃতি পেয়েছে গঙ্গার চিরপ্রবহমান স্রোতে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৩ ঃ অধিকারীর সান্নিধ্য কপালকুণ্ডলার জীবনে কী ধরনের প্রভাব ফেলেছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ কপালকুণ্ডলার জীবনের প্রথম অংশে কাপালিকের প্রভাব ছিল কি?

.....



আপনাদের করণীয় — ৬.১

(ক) নবকুমারের জীবনে ভাগ্যবিড়ম্বনা কেন ও কীভাবে নেমে এসেছিল — আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

(খ) সংসার এলেও বনচর-জীবনের টান কপালকুণ্ডলা চরিত্রটিকে নিয়ন্ত্রণ কীভাবে করেছে — নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

৬.৩.৩ মতিবিবি

কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র এই মতিবিবি। এর পূর্বনাম পদ্মাবতী। সম্পর্কে নবকুমারের প্রথমা স্ত্রী। পদ্মাবতীর পূর্ব ইতিহাস ঔপন্যাসিক সুকৌশলে আমাদের জানিয়ে দিয়েছেন। পদ্মাবতীর পিতার নাম রামগোপাল ঘোষাল। নবকুমারের সঙ্গে বিয়ের পর পদ্মাবতী কিছুদিন পিত্রালয়ে ছিল। মধ্যে মধ্যে শ্বশুরালয়ে আনাগোনা ছিল। যখন পদ্মাবতীর বয়স তেরো, তখন তার পিতা সপরিবারে পুরুষোত্তম-দর্শনে গিয়েছিলেন। ফেরার পথে তিনি পাঠানের হাতে ধরা পড়েন এবং ধর্ম বিসর্জন দিয়ে সপরিবার মুসলমান হয়ে রক্ষা পান। পদ্মাবতীও ধর্মান্তরিত হল। এবং যথারীতি স্বামী নবকুমারের সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটল।

পদ্মাবতীর পিতা রামগোপাল উচ্চাকাঙ্ক্ষী মানুষ ছিলেন। তিনি আগ্রা গিয়ে প্রতিপত্তি, ক্ষমতা ও অর্থের পেছনে ধাবমান হলেন। তাঁর কন্যাটিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরণ করল। নতুন নাম হল লুফৎ-উন্নিসা। সে দেশ-বিদেশ ভ্রমণকালে 'মতিবিবি' নাম গ্রহণ করত। আগ্রাতে বয়স বাড়ল। রূপে-গুণে বিকশিত হল সে। নৃত্য-গীত, রসালাপ, বিভিন্ন ভাষা শিক্ষায় সুশিক্ষিত হল। কিন্তু যৌবন-ধর্ম ইন্দ্রিয়-লালসাও তার মধ্যে বেড়ে উঠল।

যৌবন-দোষে আক্রান্ত লুৎফাকে কেউই বিয়ে করতে রাজি হলেন না, কেননা তার পূর্ব স্বামী ছিল। কাজেই লুৎফ-উন্নিসাও ফুলে ফুলে বিহারের সংকল্প নিল। লুৎফ-উন্নিসা গোপনে যাঁদের কৃপা বিতরণ করত— তাঁদের মধ্যে স্বয়ং যুবরাজ সেলিমও একজন। সেলিমও মজলেন। কিন্তু পদ্মাবতী লক্ষ্য ভারত-সম্রাজ্ঞী হওয়া। ঐশ্বর্য-বিলাস, যশ-প্রতিপত্তি-ক্ষমতার স্বপ্ন তাকে তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু তার প্রথম বাধা মেহের-উন্নিসা। এই মেহেরের কথা সেলিমের মুখে শুনেই তার স্বপ্নভঙ্গ হল। এবং যে-মুহূর্তে সে বুঝল যে তার আর কোনো আশা-ভরসা নেই, সেই মুহূর্তে সে সেলিমের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হল। মেহের-উন্নিসা তার বাল্যসখী। সেই বাল্যসখীর দাসী হয়ে সে থাকতে রাজি নয়। এবং ষড়যন্ত্রের জাল বুনতে সে ওড়িশা পর্যন্ত গেল। ফেরার পথে তার সঙ্গে পান্থশালায় পূর্বস্বামী নবকুমারের সঙ্গে দেখা। বঞ্চিতা পদ্মাবতীর মনে অকস্মাৎ পূর্বস্মৃতি জেগে উঠল।

ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতাই মতিবিবি ওরফে লুৎফ-উন্নিসা ওরফে পদ্মাবতীর জীবনের মূল লক্ষ্য। ছলে-বলে-কৌশলে সে তার স্বার্থসিদ্ধি চায়। চায় ভোগের চরিতার্থতা। পথে নবকুমারকে দেখে তার মধ্যে আবার সেই ভোগী-লোভী সত্তা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল। সেলিমকে সিঁড়ি বানিয়ে সে উচ্চ আসনে যখন উঠতেই পারল না— তখন নবকুমারের কন্দর্পকান্তি সৌম্য রূপ তাকে আবার আসঙ্গ লিপ্সার দিকে ঠেলে দিল। বর্ধমানে গিয়ে মেহের-উন্নিসার মনোভাবও সে জেনে গেছে। সব মিলিয়ে সপ্তগ্রামে ফিরে নবকুমারের সান্নিধ্যকে আঁকড়ে ধরতে চাইল। নবকুমারের সঙ্গে তার যখন বিয়ে

হয়— তখন সে কিশোরী মাত্র। এখন সে পূর্ণ যৌবনা। অভিজ্ঞা। ছলাকলায় সিদ্ধা। কিন্তু তার জীবনে শান্তি নেই, স্বস্তি নেই। আনন্দ নেই। জীবনে যা পেয়েছে— তাতে সে সন্তুষ্ট নয়। গভীর অতৃপ্তিই তার নিত্য সহচর।

তিন বছর রাজপ্রাসাদের ছায়ায় বসে যা সে পায়নি, উড়িষ্যা থেকে ফেরার পথে একরাত্রে নবকুমারের সান্নিধ্যে তা পেয়েছে সে। তাই মনে মনে সংকল্প নিয়েছে— নবকুমারকে তার চাইই চাই।

মতির মধ্যে রূপ-যৌবনের অহংকার ছিল। ভেবেছিল— নবকুমার তা পেয়ে গলে যাবেন। কিন্তু দরিদ্র ব্রাহ্মণ নবকুমার তাকে মুহূর্তেই প্রত্যাখ্যান করবেন— সে-কথা সে স্বপ্নেও কল্পনা করতে পারেনি। নারী সব সহ্য করতে পারে, পারে না শুধু ভালোবাসার অবমাননা সহ্য করতে। নবকুমারের এই তীব্র প্রত্যাখ্যান পদ্মাবতীকে ক্ষিপ্ত করে তোলে। এ কূল ও কূল —সব কূল হারিয়ে তখন তার জীবন-নৌকা ঢলমল। সে ধারণা করে— কপালকুণ্ডলার রূপজ আকর্ষণের জন্যই নবকুমার তাকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। তাই সে নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্যজীবনে আগুন লাগাতে তৎপর হল। তার সঙ্গে এসে জুটল ঈর্ষা। কিন্তু কপালকুণ্ডলার সঙ্গে কথাবার্তায় সে বিস্মিত হল। কপালকুণ্ডলা অকপটে তাকে বলে— 'আমি তোমার সুখের পথ কেন রোধ করিব? তোমার মানস সিদ্ধ হউক... ...আমি বনচর ছিলাম, আবার বনচর হইব।' কপালকুণ্ডলার এরকম সহৃদয় ত্যাগ সে কল্পনাও করেনি। তার সম্বিৎ ফিরে আসে, হৃদয়ে সহানুভূতির ফল্গুধারা বইতে থাকে। সে কপালকুণ্ডলাকে বাঁচাতে চায় কাপালিকের হাত থেকে। পাঠাতে চায় বর্ধমানে। কপালকুণ্ডলা রাজি না-হওয়াতে অশ্রুজলে তাকে একটি আংটি উপহার দেয়— চিরস্মৃতি অটুট রাখার জন্য। এরপর আর উপন্যাসে পদ্মাবতী বা লুৎফ-উন্নিসা বা মতিবিবির আর কোনো প্রসঙ্গ নেই। জীবনের পথে সে হারিয়ে যায়।

উপন্যাসের তৃতীয় খণ্ড, প্রথম পরিচ্ছেদে বঙ্কিমচন্দ্র লিখেছেন— 'মতির চরিত্র মহাদোষে কলুষিত, মহদ্‌গুণেও শোভিত।' কথাটি যথার্থ। প্রভূত দোষের মধ্যে তার অন্তঃকরণে একটি সংবেদনশীল নারী ছিল। পরিস্থিতিও অনেকটা তাকে ভোগের পথে ইন্দ্রিয়ের দিকে ঠেলে দিয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণকন্যার সংস্কার সম্পূর্ণ নিঃশেষ করতে পারেনি। প্রথম যৌবনে স্বামীসুখ বঞ্চিতা হওয়ার ফলেই তার মধ্যে একটি অস্থিরচিত্ত নারীর জন্ম হয়। কিন্তু সেও হয়তো অবচেতনে স্বামী-পুত্র-পরিবারের স্বপ্ন লালন করত মনে। তাই নবকুমারকে আবার পেয়ে সেই অধরা স্বপ্নপূরণের সাধ জেগেছিল। তার হৃদয়ে উদারতারও স্পর্শ ছিল। সুন্দরী স্ত্রীলোক কপালকুণ্ডলাকে সে স্বল্প পরিচয়ের মধ্যেই অলংকার দান করেছে। মনের সুখে সাজিয়েছে। কপালকুণ্ডলাকে বিদায় কালেও দিয়েছে বহুমূল্য আংটি। না-পাওয়ার বেদনাই তাকে বারে বারে তরঙ্গ তাড়িত করেছে। এজন্য দু-দুটো ষড়যন্ত্রে সে লিপ্ত হয়েছে এবং ব্যর্থও হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় সে

তার অন্তরের কথাকে তুলে ধরতে দ্বিধা করেনি। মেহের-উন্নিসা ও সেলিম বৃত্তান্তে সে যখন তার ভাগ্যের পরিহাসকে বুঝেছে— তখন সে অকপটে সেলিমের কাছে পূর্ব স্বামীকে ফিরে পাবার অনুমতি প্রার্থনা করেছে। আবার, কপালকুণ্ডলার সর্বনাশ করতে এসেও সে কপালকুণ্ডলাকে অকপটে নিজের জীবনের যাবতীয় কাহিনি বলেছে। দুই বিপরীত সত্তার মধ্যে পদ্মাবতী চরিত্রটি উদ্‌ভাসিত।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নটির সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৫ ঃ মতিবিবির চরিত্রের দুটি দিক কী কী?

.....

৬.৩.৪ কাপালিক

এবারে কাপালিক চরিত্রটি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। প্রচলিত অর্থে যাকে 'খলচরিত্র' বলে, কপালকুণ্ডলার খলচরিত্র এই কাপালিক। একটি বিশেষ দুর্লভ শ্রেণির মানুষ এই কাপালিক। এই শ্রেণির লোকেরা তন্ত্রসাধক হয়। এই তান্ত্রিকেরা তাদের 'সাধনা'র নামে নরবলি দেয়। এরা শক্তি-সাধনা করে। এবং ভক্তির নামে কদাচারী বা বামাচারী হয়। অন্ধবিশ্বাসই এদের পুঁজি। আধুনিক মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিতে এরা এক ধরনের মানসিক বিকৃতির শিকারও বলা যেতে পারে।

'স্তূপশিখরে' নামক অধ্যায়ে বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমারের দৃষ্টিতে কাপালিকের এক ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরেছেন উপন্যাসের শুরুতে। সমুদ্রতীরে পরিত্যক্ত ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর নবকুমার দেখেছেন দূরে একটি অগ্নিবিন্দু। ক্রমশ কাছে গিয়ে দেখা গিয়েছে— একটি মানুষ চোখ বন্ধ করে ধ্যানমগ্ন।

একটা ভয়ংকর পরিবেশে ভয়ানকভাবে এই কাপালিকের সঙ্গে নবকুমারের মতো আমাদেরও দেখা। আমরা আরও দেখলাম, চারপাশে ছড়ানো মনুষ্য-হাড়। মানুষের হাড় দিয়ে বানানো মালা ঝুলছে তান্ত্রিকের গলায়। ইত্যাদি ইত্যাদি।

এহেন পরিবেশ থেকে বোঝা যায়, নররক্তে দেবীপূজা করে সাধনায় সিদ্ধি লাভের কৃচ্ছ্রসাধনায় লিপ্ত এই কাপালিক। একটি গলিত শবের ওপর বসে যে-ব্যক্তি 'সাধনা' করতে পারে— সে যে কতটা ভয়ানক, সে-কথা নবকুমার বোঝেননি।

কাপালিক চরিত্র বীভৎস মানসিকতার। নবকুমার যখন ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে আশ্রয় সন্ধান করেছেন— তখন কাপালিক তাঁকে বলেছে— 'ভৈরবীপ্রেরিতোহসি মামনুসরঃ'। অর্থাৎ তোমাকে ভৈরবী প্রেরণ করেছেন এখানে, আমার পেছনে এসো। ভৈরবী নবকুমারকে বলিপ্রদত্ত মনুষ্য হিসাবে প্রেরণ করেছেন— এই বিশ্বাসই কাপালিকের সত্তার মূল দিক। সে একমাত্র জানে তার অন্ধ বিকৃত বিশ্বাসকে। মনুষ্যরক্তে রঞ্জিত হয়ে

ভৈরবীর সাধনা করে সে সিদ্ধকাম হতে চায়।

কপালকুণ্ডলার বুদ্ধিতে নবকুমারের জীবন রক্ষা হয়েছে এবং অধিকারী মশাইর মুখ থেকে আমরা এই কাপালিকের সম্পর্কে আরও কিছু তথ্য লাভ করেছি। অধিকারী বলেছেন— এই 'মহাপুরুষ' অতি ভয়ানক। তার পক্ষে যে-কোনো কাজই সম্ভব। বাহ্যত উপন্যাসের নায়িকা কপালকুণ্ডলার পালক-পিতা এই তান্ত্রিক। সমুদ্রতীরে শিশু কপালকুণ্ডলাকে পেয়ে সে লালন-পালন করেছিল। কিন্তু পালনকারী হলেও সে 'পিতা' হয়ে উঠেনি। পিতৃত্বের ছিঁটেফোঁটাও তার মধ্যে ছিল না। এমনকি কপালকুণ্ডলাকে পালনের মধ্যে তার কোনো মহৎ উদ্দেশ্য ছিল না। কপালকুণ্ডলা যদিও পালনকারীর প্রতি সহমর্মিতা ব্যক্ত করেছে এইভাবে— 'তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া যাইতে আমার মন সরিতেছে না। তিনি যে আমাকে এতদিন প্রতিপালন করিয়াছেন।' উত্তরে অধিকারী তাকে বলেছেন— 'কি জন্য প্রতিপালন করিয়াছেন, তাহা জান না।' এরপর বঙ্কিমের ভাষায় ঃ 'অধিকারী তান্ত্রিক সাধনে স্ত্রীলোকের যে সম্বন্ধ, তাহা অস্পষ্ট রকম কপালকুণ্ডলাকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন, অর্থাৎ, সোজা কথায়— কাপালিক একজন বিকৃতকামী— কপালকুণ্ডলাকে লালন করেছে এইজন্য যে একদিন সে বড় হবে এবং তার বামাচারী তন্ত্র-সাধনার সঙ্গিনী হবে। অধিকারী মশাইর ভাষায়— 'কাপালিক ইহাকে (কপালকুণ্ডলাকে) প্রাপ্ত হইয়া আপন যোগসিদ্ধিমানসে প্রতিপালন করিয়াছিলেন। অচিরাৎ আত্মপ্রয়োজন সিদ্ধ করিতেন।'

এই হল কাপালিক চরিত্রের আসল দিক। কপালকুণ্ডলার ক্ষেত্রে তার পিতৃত্ব ছিল না। ছিল একমাত্র অন্ধ ধর্মীয় গোড়ামি। এবং ধর্মের নামে যে-কোনো পর্যায়ে তার চরিত্র অবনমিত হতে পারে। এর প্রমাণ আমরা পাই উপন্যাসের উপান্তে।

কপালকুণ্ডলার সঙ্গে নবকুমারের বিবাহের পর কাপালিকের আর কোনো সন্ধান পাওয়া যায় না। প্রথম খণ্ডের সপ্তম পরিচ্ছেদে শুধু জানা গেছে পলাতক নবকুমার ও কপালকুণ্ডলাকে খুঁজতে খুঁজতে কাপালিক এক উচ্চ বালিয়াড়ির ওপর ওঠে এবং 'পর্বতচ্যুত মহিষের ন্যায়' পড়ে যায়।

চতুর্থ খণ্ডের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ থেকে জানা যায়— বালিয়াড়ির ওপর থেকে পতনের ফলে কাপালিকের উভয় বাহু ভগ্ন হয়েছে। নিত্য-নৈমিত্তিক কাজ চলে, কিন্তু ওই বাহু দ্বারা বলপ্রয়োগ তো দূরের কথা কাষ্ঠ সংগ্রহও করতে পারে না কাপালিক। একেই বলে নিয়তি। একদিন যে-বাহু অসহায় মানুষকে বলি দিত— সেই বাহু চিরদিনের জন্য ভগ্ন হয়েছে। কিন্তু দুরাচারী কাপালিকের মনের বিষ কমেনি। কপালকুণ্ডলার প্রতি প্রতিহিংসায় সে খুঁজতে খুঁজতে এসে সপ্তগ্রামে নবকুমারের গৃহসংলগ্ন জঙ্গলে আশ্রয় নিয়েছে। এখানেও তার অন্ধ ধর্মীয় সংস্কার প্রকট। সে ভবানীর নামে কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে চায়। স্বপ্নে নাকি সেই নির্দেশই পেয়েছে। কিন্তু বলি দেওয়ার শক্তি তার নেই। তাই নবকুমারের কপালকুণ্ডলার প্রতি সন্দেহের সুযোগ নিয়ে সে নবকুমারকে দিয়ে কার্য উদ্ধারে তৎপর হয়েছে। তার প্রবৃত্তি জাগানোর জন্য তাকে আকণ্ঠ মদ্যপান

করিয়েছে। অর্থাৎ অশক্ত শরীরেও সে শ্বাপদের মতো প্রতিহিংসাপরায়ণতায় ভুগেছে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৬ ঃ কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে কেন প্রতিপালন করেছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে কেন বলি দিতে চেয়েছিল?

.....



আপনাদের করণীয় — ৬.২

(গ) কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে মতিবিবির প্রাসঙ্গিকতা কতখানি — আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

(ঘ) অরণ্য-জীবন ও গৃহ-জীবন — এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব আলোচ্য উপন্যাসে কীভাবে পরিস্ফুট — আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)

৬.৪ অলৌকিকতা

আসুন, সব শেষে আমরা এই উপন্যাসে অলৌকিকতা নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করি। লৌকিক দৃষ্টিতে যার ব্যাখ্যা আপাতত কঠিন— সেইসব দৈবী ঘটনাকে অলৌকিক বলেই চিহ্নিত করা হয়। 'কপালকুণ্ডলা' উপন্যাসের শুরু থেকে কয়েকটি অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। জীবন-রহস্যের দুর্জ্ঞেয় দিকগুলোই এর দ্বারা চিহ্নিত হয়েছে।

কাপালিকের কবল থেকে নবকুমারকে নিয়ে অধিকারী মশাইর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছে কপালকুণ্ডলা। অধিকারী কপালকুণ্ডলার ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে বিয়ে দিতে চেয়েছেন। এবং এর জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেছেন দেবীর কাছে, বিল্বপত্র প্রদানের মধ্য দিয়ে। প্রথমবার বিল্বপত্র পতিত হয়নি। কিন্তু বিয়ের পর যাত্রার প্রাক্কালে কপালকুণ্ডলা কালী-প্রণামার্থে মন্দিরে গেল। তারপর— "ভক্তিভাবে প্রণাম করিয়া, পুষ্পপাত্র হইতে অভিন্ন বিল্বপত্র প্রতিমার পাদোপরি স্থাপিত করিয়া তৎপ্রতি নিরীক্ষণ করিয়া রহিলেন। পত্রটি পড়িয়া গেল।" ভক্তিপরায়ণা কপালকুণ্ডলা এতে অত্যন্ত ভীত হল। এবং ঘটনাটি শুনে বিষণ্ণ হলেন স্বয়ং অধিকারীও। একটা অনিশ্চয়তা, অমঙ্গলময়তার ছায়া যেন ঘনীভূত হল। অধিকারী বললেন— "এখন নিরুপায়; এখন পতিমাত্র তোমার ধর্ম। পতি শ্মশানে গেলে তোমাকে সঙ্গে সঙ্গে যাইতে হইবে। অতএব নিঃশব্দে চল।"

মাতৃপদে অর্পিত বিল্বপত্রটি মা গ্রহণ করেননি— এই গ্রহণ-না করার সংকেতটির মধ্যে রয়ে গেছে উপন্যাসের পরিণতির ইঙ্গিত। বাহ্যত ঘটনাটি নিতান্তই সহজ ও বিশ্বাসজাত। কিন্তু ব্যঞ্জনার্থে

বোঝা যায়— এই আকস্মিক বিবাহ সুখের সংসার হয়ে উঠবে না। এর পরিণতি ভয়াবহ। ধ্বংসাত্মক। তান্ত্রিকের দ্বারা প্রতিপালিত কপালকুণ্ডলার মধ্যে আশৈশব ধর্মীয় সংস্কার প্রকট থাকাই স্বাভাবিক। এবং কালীমায়ের পায়ে নিবেদিত বেলপাতার পতনটি তার মনোগঠনে আলোড়ন তুলেছে। সে ঘটনাটিকে ভোলেনি। এবং একটি সুদূরপ্রসারী ছাপও থেকে গেছে এতে। বিবাহিত জীবনে কথাপ্রসঙ্গে সে ননদ শ্যামাসুন্দরীকে বলেছে— "যাহা বিধাতা করাইবেন, তাহাই করিব। যাহা কপালে আছে তাহাই ঘটিবে।" কেননা— "যে দিন স্বামীর সহিত যাত্রা করি, যাত্রাকালে আমি ভবানীর পায়ে ত্রিপত্র দিতে গেলাম। আমি মার পাদপদ্মে ত্রিপত্র না দিয়া কোন কর্ম করিতাম না। যদি কর্মে শুভ হইবার হইত, তবে মা ত্রিপত্র ধারণ করিতেন; যদি অমঙ্গল ঘটিবার সম্ভাবনা থাকিত, তবে ত্রিপত্র পড়িয়া যাইত। ...ত্রিপত্র মা ধারণ করিলেন না— অতএব কপালে কি আছে জানি না।"

অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার জীবনে এই ঘটনাটি চূড়ান্ত পরিণতির সূচক হয়ে দাঁড়িয়েছে। সংসারের বাস্তব বুদ্ধি তার ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল হয়নি, হয়েছি সংস্কার তথা ওই অলৌকিক মুহূর্তটি। সে ধরেই নিয়েছে, বিয়ের শুরুতেই যখন কালীমাতা তার বিল্বপত্রটি গ্রহণ করেননি— সুতরাং সুখ-শান্তি-স্বস্তি তার জীবনে নেই। এবং তার বিশ্বাসই উপন্যাসকে পরিণতির দিকে ঠেলে দিতে বাধ্য করেছে।

*কপালকুণ্ডলা*তে আরও দুটি অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ ঘটাতে চেয়েছেন বঙ্কিমচন্দ্র — (১) কাপালিকের স্বপ্ন, এবং (২) কপালকুণ্ডলার স্বপ্ন। স্বপ্ন ব্যাপারটির আধুনিকতামণ্ডিত ব্যাখ্যা হতেই পারে, কিন্তু আলোচ্য উপন্যাসে সেই দুটি স্বপ্নকে এক অলৌকিক-অদৃশ্য নিয়তির গূঢ় নির্দেশ জাতীয় ইঙ্গিত রূপে উপস্থাপন করেছেন ঔপন্যাসিক।

ভগ্নবাহু কাপালিক যখন পীড়িত, ক্ষণে জ্ঞান, ক্ষণে অজ্ঞান তখন একদিক প্রাতে যেন সে শুনতে পেয়েছে আরাধ্য দেবী মাতা ভৈরবীর আদেশ— 'ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় তুই এতদিন কুমারীর শোণিত উৎসর্গ করিসনি, আমার পূজায় তাই এত বিঘ্ন।' এবং প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে হবে। এখানে দেবীর স্বপ্নাদেশ অলৌকিকভাবে প্রতিপন্ন হয়েছে— এবং কপালকুণ্ডলার জীবনের নাটকীয় পরিণামের সহায়ক হয়েছে।

দ্বিতীয় স্বপ্নটি নায়িকা কপালকুণ্ডলার। বাইরে ঝড়। কপালকুণ্ডলার মনেও ঝড়। সেই রাত্রে তার স্বপ্নেও ঝড়ের প্রকোপ। এক উন্নত-জটা প্রকাণ্ড কাপালিক তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করতে চাইছে। এমন সময় এক ব্রাহ্মণবেশী এসে তার জীবনতরী রক্ষা করে। কপালকুণ্ডলা তাকে 'নিমগ্ন কর' বলতে সে ছেড়েও দেয়। তখন তরীটি মুখর হয়ে বলে ওঠে— 'আমি আর এই ভার বইতে পারি না, আমি পাতালে প্রবেশ করি। এবং সত্যি সত্যি নৌকোটি তাকে জলে ফেলে পাতালে প্রবেশ করে।

এই স্বপ্নের মধ্যেও একটি অলৌকিকতার আভাস আছে। এখানে ব্রাহ্মণবেশী আসলে মতিবিবি। আর কাপালিক পূর্বোক্ত পালক পিতা। আত্মবিসর্জনের সংকল্পও এই ঘটনারই রেশ। এবং তখনই সে শুনতে পায়— এক দৈববাণী। ঊর্ধ্বে তাকিয়ে দেখে ভৈরবী দক্ষিণ হস্ত তুলে

তাকে আহ্বান করছেন। মুণ্ডমালাধারিণী ভৈরবীই যেন কপালকুণ্ডলার জীবনের পথ-নির্দেশক। মেঘের মধ্যে তিনি কখনো স্পষ্ট, কখনো-বা অস্পষ্ট। শ্মশানের দিকে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এবং তখন কপালকুণ্ডলা দেখে তিনি আকাশে অট্টহাস্যরতা। একটি দীর্ঘ ত্রিশূল ধরে কাপালিকের পথের দিকে তাঁর স্পষ্ট নির্দেশ।

এই সব অলৌকিক ইঙ্গিত উপন্যাসের মূল উপজীব্য অর্থাৎ কপালকুণ্ডলার নির্মম পরিণতির দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে ও ইঙ্গিত বহন করে।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

নীচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন—

প্রশ্ন নং ৮ ঃ কাপালিকের স্বপ্নটি কী ছিল?

.....



আপনাদের করণীয় — ৬.৩

(ঙ) *কপালকুণ্ডলা* উপন্যাসে অলৌকিক দৃশ্য সংযোজনের ফলে উপন্যাসটি কীভাবে পরিণতির দিকে গেছে — আলোচনা করুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)



৬.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- এই অধ্যায়টি অবলম্বনে আমরা উপন্যাসের চারটি মুখ্য চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হলাম। উপন্যাসের নায়ক নবকুমার এক ভাগ্যবিড়ম্বিত ও রোমান্টিক মেজাজের ব্যক্তি। বস্তুত, নায়িকা কপালকুণ্ডলার জীবনকে আলোকিত করার জন্যেই নবকুমার চরিত্রের অবতারণা ও প্রাসঙ্গিকতা।
- নায়িকা কপালকুণ্ডলা আশৈশব বন্য-জীবনে পালিতা হওয়ায় তার মধ্যে সেই সংস্কারই আগাগোড়া প্রকট। সংসার তাকে বাঁধতে পারেনি। মুক্ত জীবনই তার কাম্য ছিল। তাই মৃত্যুর মধ্যে তার চিরমুক্তি ঘটেছে।
- উপন্যাসের প্রতি-নায়িকা মতিবিবি ওরফে পদ্মাবতী অত্যন্ত আকর্ষণীয় চরিত্র। প্রবৃত্তি ও জীবন — এই দুইয়ের দ্বন্দ্বে তার বিকাশ। কাপালিক চরিত্রের মূল প্রতিপাদ্য হল ধর্মীয় অন্ধ কুসংস্কার ও প্রতিহিংসা।
- উপন্যাসে কিছুটা অলৌকিক ঘটনার সমাবেশ উপন্যাসটিকে অন্য মাত্রা এনে দিয়েছে।



৬.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) বাগচী, শশাঙ্কশেখর (সম্পাঃ); *কপালকুণ্ডলা।*
২) বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীকুমার; *বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা।*
৩) বন্দ্যোপাধ্যায়, সরোজ; *বাংলা উপন্যাসের কালান্তর।*
৪) ভট্টাচার্য, অরূপকুমার; *উপন্যাসশিল্পী বঙ্কিমচন্দ্র।*
৫) সেনগুপ্ত, সুবোধচন্দ্র; *বঙ্কিমচন্দ্র।*

৬.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নবকুমারের মধ্যে এক রোমান্টিক-ভাবুক-সৌন্দর্যবিলাসী মানুষ দেখা যায়।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নবকুমার একদিকে সৎ, নিষ্ঠাবান, পরোপকারী, ভাবুক ও উদাসীন। আবার অন্যদিকে অবিবেচক, হটকারী ও দূরদৃষ্টিহীন, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দুর্বল।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ অধিকারীর সান্নিধ্য কপালকুণ্ডলার মধ্যে এক মানবিক অনুভূতির জন্ম দিয়েছিল।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ধর্মীয় বিশ্বাস, বিশেষত দৈব শক্তির ওপর আস্থা এবং অরণ্য-জীবনের প্রতি মোহ।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ মতিবিবির মধ্যে প্রবৃত্তি-তাড়িত, উচ্চাকাঙ্ক্ষী এক নারী ছিল। আবার তার মধ্যে সহানুভূতিশীল নারী-হৃদয়ও দেখা গেছে।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাপালিক কপালকুণ্ডলাকে তার সাধন-সঙ্গিনী করার জন্যে প্রতিপালন করেছিল।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ প্রতিশোধ গ্রহণের জন্য; কেননা কপালকুণ্ডলা নবকুমারকে পলায়ন করতে সাহায্য করেছিল। দ্বিতীয় করণ, ধর্মীয় বিশ্বাস — যেখানে সে স্বপ্নে ভবানীর আদেশ পেয়েছিল।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কাপালিক স্বপ্নে দেখেছে — মা ভবানী তাকে আদেশ করছেন — 'ইন্দ্রিয় চরিতার্থতায় তুই এতদিন কুমারীর শোণিত উৎসর্গ করিসনি, আমার পূজায় তাই এত বিঘ্ন।' তাই কপালকুণ্ডলাকে বলি দিতে হবে।



৬.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ নবকুমারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ২ ঃ কপালকুণ্ডলা চরিত্রের মধ্যে দুই বিপরীত সত্তা কীভাবে চরিত্রটিকে চালিত করছে— নিজের ভাষায় ব্যক্ত করুন।

প্রশ্ন ৩ ঃ প্রবৃত্তি ও মানবিকতা — এই দুই দিক মতিবিবির জীবনকে কীভাবে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সে-বিষয়ে সংক্ষেপে আলোকপাত করুন।

প্রশ্ন ৪ ঃ 'কাপালিক এই উপন্যাসে এক ধর্মীয় অন্ধবিশ্বাসী, হিংস্র ও অমানবিক উপাদানে তৈরী।' — আলোচনা করুন।

প্রশ্ন ৫ ঃ আলোচ্য উপন্যাসে অলৌকিকতার প্রাসঙ্গিকতা কতখানি — নিজের অভিমত জ্ঞাপন করুন।

*** ***** ***

অধ্যায় ৭ ঃ বনফুল — 'জাগ্রত দেবতা'

অধ্যায়-বিন্যাস

৭.১ পরিচিতি

৭.২ জ্ঞাতব্য বিষয়

৭.৩ বনফুলের জীবন ও সাহিত্য

৭.৪ জাগ্রত দেবতা

৭.৪.১ গল্পের সার সংক্ষেপ

৭.৪.২ গল্প-বিশ্লেষণ

৭.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

৭.৬ অতিরিক্ত পঠন

৭.৭ অগ্রগতি-নির্ধারক উত্তর

৭.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

৭.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি —

- বনফুলের সংক্ষিপ্ত জীবনী জানতে পারবেন, বনফুলের সাহিত্য সম্পর্কে জানবেন
- কবি বনফুল কীভাবে গল্পকার হয়ে উঠলেন, সেকথা জানতে পারবেন
- পারিবারিক ও সামাজিক কোন প্রেক্ষাপটে বনফুলের লেখক সত্তা বিকশিত হয়েছিল তা জানতে পারবেন
- বনফুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের বিষয়ে জানবেন
- 'জাগ্রত দেবতা' গল্পে বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী লেখকের কলমে প্রচলিত কুসংস্কারের প্রতি তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গের সাক্ষাৎ পাবেন
- গ্রাম বাংলার উৎসব আয়োজন সম্পর্কে জানবেন
- বনফুলের গল্প বলার চমৎকারিত্বের সঙ্গে পরিচিত হবেন।

৭.২ পরিচিতি

এই অধ্যায়ে বনফুলের জন্ম, বড় হয়ে ওঠা, তাঁর জীবনের নানা ওঠাপড়ার বিষয়ে আলোচনা করা হয়েছে। বনফুলের বড় হয়ে ওঠার প্রেক্ষাপট ও তাঁর জীবনকালের বিভিন্ন সামাজিক ঘটনাক্রমের উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ে। এসব জানা থাকলে বনফুলের লেখালিখি বিশ্লেষণে আপনাদের সুবিধা হবে। কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু করে বনফুল কীভাবে গল্পকার হয়ে উঠলেন সে বিষয়েও জানতে পারবেন আপনারা। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, আত্মজৈবনিক লেখা —

সাহিত্যের নানা শাখায় বনফুলের উল্লেখযোগ্য রচনাগুলির উল্লেখ রয়েছে এই অধ্যায়ে। লেখকের জীবনে সমকালীন অন্যান্য খ্যাতিমান লেখকদের পরিচয় ও প্রভাবের দিকটিও সংক্ষেপে আলোচিত হয়েছে। লেখকের জীবনের নানা মজার ঘটনার উল্লেখ আপনাদের কাছে আকর্ষক হয়ে উঠতে পারে।

এই অধ্যায়ে আপনারা বনফুলের একটি গল্পও পড়বেন। গল্পগুলি যে বইটি থেকে নেওয়া তার নাম *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প*। বইটির ভূমিকা লিখেছেন জগদীশ ভট্টাচার্য। ১৩৫৫ সনে বইটি প্রথম প্রকাশিত হয়। এই অধ্যায়ে বয়েছে 'জাগ্রত দেবতা' নামক গল্পেটির মূল পাঠ ও আলোচনা। 'জাগ্রত দেবতা' গল্পটি লেখক সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাসের বিরুদ্ধে কলম ধরেছেন।

৭.৩ বনফুলের জীবন ও সাহিত্য

বনফুলের জন্ম ১৮৯৯ সালের ১৯ জুলাই তারিখে। তাঁর জীবনকাল প্রায় ৮০ বছর। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তিনি মারা যান। দীর্ঘ জীবনে তাঁর রচিত সাহিত্যের তালিকাটিও বেশ লম্বা, তাঁর রচিত উপন্যাসের সংখ্যা অর্ধশতাধিক। নাটক লিখেছেন ১৫ টি। কবিতার সংখ্যা তিনশোরও বেশি। বেশ কয়েকটি প্রবন্ধ সংকলনও রয়েছে তাঁর। রয়েছে আত্মজীবনী ও স্মৃতিচারণ গ্রন্থও। অবশ্য বনফুলের অন্যতম পরিচয় গল্পকার হিসেবেই। পরের অধ্যায় দুটিতে আপনারা তাঁর কয়েকটি গল্প পড়বেন। এখানে কেবল জেনে রাখুন বনফুলের প্রকাশিত গল্পের সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। বনফুলের সাহিত্যসৃষ্টি সম্পর্কে আর একটি উল্লেখযোগ্য তথ্য এই যে, — বাংলা সাহিত্যে অতি ক্ষুদ্র গল্প ও সুবৃহৎ উপন্যাস রচিত হয়েছে তাঁরই কলমে।

'বনফুল' আসলে লেখকের ছদ্মনাম। প্রকৃত নাম বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। বলাইচাঁদের ছদ্মনাম নেওয়ার পিছনে এক মজার গল্প আছে। সে গল্প একটু পরে বলছি। আমরা তাঁকে 'বনফুল' বলেই উল্লেখ করব। বনফুলের বাবার নাম সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়। মা মৃণালিনী দেবী। সত্যচরণ পেশায় ছিলেন ডাক্তার। তাঁদের আদি বাড়ি ছিল হুগলি জেলার শেয়াখালা গ্রামে। সেখানে তাঁরা 'কাঁটাবুনে মুখুজ্জে' নামে পরিচিত ছিলেন। বনফুলের ঠাকুমা যখন মারা যান, সত্যচরণ তখন খুবই ছোট। ছোট বেলায় মা মারা যাওয়ায় সত্যচরণ সাহেবগঞ্জের মামাবাড়িতেই প্রতিপালিত হন। পড়াশোনাও সেখানেই। পরবর্তীকালে ডাক্তারি পাশ করার পর সত্যচরণ বিহারের পূর্ণিয়া জেলার মণিহারী গ্রামে চলে যান ডাক্তারি করতে। বিহারের এই মণিহারী গ্রামেই বনফুলের জন্ম। গঙ্গা নদী এবং কোশী নদীর সঙ্গমে অবস্থিত এই মণিহারী গ্রাম। নদী, পাহাড়ও জঙ্গলে ঘেরা এই গ্রামের উদার প্রাকৃতিক পরিবেশে বড় হতে থাকেন বলাইচাঁদ।

বনফুলের সাহিত্যিক হয়ে ওঠার পিছনে তাঁর পারিবারিক প্রেক্ষাপটটি খুবই সহায়ক হয়ে উঠেছিল। যেকোনো মানুষের কিশোর বয়েসের স্মৃতি পরিণত বয়সে বারবার ঘুরেফিরে আসে। আগেই বলেছি বনফুলের বাবা ছিলেন ডাক্তার। তাঁর ছিল বিশাল ***একান্নবর্তী পরিবার***। সনাতন হিন্দু ব্রাহ্মণ হ'লেও তিনি রক্ষণশীল ছিলেন না। বনফুলদের বাড়িতে জাতিধর্ম নির্বিশেষে আশ্রিত আত্মীয় কুটুম, পরিচিত অপরিচিতের ভিড় লেগেই থাকত। সত্যচরণ ছিলেন সংস্কারমুক্ত, বন্ধুবৎসল,



একান্নবর্তী পরিবার ঃ যে পরিবারের সদস্যরা একই অন্নে প্রতিপালিত হন। অর্থাৎ যৌথ পরিবার। একসময় গ্রামীণ বাংলায় অধিকাংশ পরিবারই একান্নবর্তী ছিল। কর্মব্যস্ততা, নাগরিকতা, ব্যক্তি-স্বাতন্ত্রের বিকাশেয় সঙ্গে সঙ্গে যৌথ পরিবার ভাঙতে আরম্ভ করে।

গুণগ্রাহী এবং অত্যন্ত জনপ্রিয়। নিজের থিয়েটারের দল ছিল তাঁর। বেশির ভাগ সময় সেই থিয়েটারের দলের লোকেদের খাওয়া থাকার ব্যবস্থা হত সত্যচরণের বাড়িতে। বাড়ির পাশেই ছিল রেল স্টেশন। তাঁর বাড়িতে একবেলা খেয়ে ট্রেন ধরতেন পরিচিতরা। গঙ্গা স্নানে পুণ্য সঞ্চয়ে যাঁরা আসতেন তাঁদেরও ভিড় জমত সত্যচরণের বাড়িতে। ওই অঞ্চলে কোনো হোটেল বা ডাকবাংলো না থাকায়, গভর্নমেণ্ট অফিসারেরা আতিথ্য নিতেন মাঝেমধ্যেই। এমনই অসংখ্য মানুষের মধ্যে বড় হয়ে ওঠেন বনফুল। শুধু মানুষই নয়, সত্যচরণের গৃহপালিত পশু পাখির সংখ্যাও নেহাত কম ছিল না। অনেকগুলি গরু, কয়েকটি কুকুর, খরগোস, গিনিপিগ, দুটি বড় জাতের পাহাড়ি ঘোড়া এবং প্রচুর পাখি পুষতেন সত্যচরণ। *সাহিত্য, প্রদীপ, প্রবাসী, বসুমতী, হিতবাদী, বঙ্গবাসী* ইত্যাদি পত্রিকার গ্রাহক ছিলেন তিনি। খুব সহজেই বোঝা যায় উদার প্রাকৃতিক পরিবেশ, বিচিত্রতর মানুষের সান্নিধ্য, এবং শিল্প সাহিত্যের প্রতি পারিবারিক অনুরাগ বনফুলের মন ও মানসিকতায় একটা গঠনমূলক ছাপ ফেলেছিল।

বনফুলের কিশোর মনে পরিবারের আরো দুজন মানুষ গভীর প্রভাব ফেলেছিল— মা মৃণালিনী দেবী এবং কাকা চারুচন্দ্র। মৃণালিনী ছিলেন নির্লোভ, ধার্মিক, নিঃস্বার্থ এবং তেজস্বিনী। রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে তিনি তবু স্বামীর জাতিধর্মভেদহীন উদারতাকে সহজেই মেনে নিয়েছিলেন। প্রাণরক্ষার খাতিরে শিশু বলাইচাঁদকে তিনি মুসলমানীর বুকের দুধ খাওয়াতে সম্মত হয়েছিলেন। নিজের হাতে রুগ্ন ছেলেকে মুরগির মাংস রান্না করে দিয়েছেন ডাক্তারি মতে। আবার একই সঙ্গে গঙ্গায় স্নান করে শুদ্ধও হয়েছেন।

বনফুলের কাকা চারুচন্দ্র ছিলেন অদ্ভুত মানুষ। সত্যচরণের বিপরীতে তিনি ছিলেন গোঁড়া ও ছুঁৎমার্গী। অথচ জাতিধর্ম নির্বিশেষে সকলেই তাঁকে শ্রদ্ধা করত। গ্রামের এক ধনী ব্যক্তি তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাবশত গ্রামে মাইনর ক্লাসের জন্য স্কুলবাড়ি তৈরি করে দেন। চারুচন্দ্র ছিলেন সেই স্কুলের হেডমাষ্টার। কাকার স্কুলে দেড় বছরের ছোট ভাই ভোলার সঙ্গে একই ক্লাসে ভর্তি হন বলাইচাঁদ। তখন তার বয়স নয় বছর। এই স্কুলেই বনফুলের সাহিত্য রচনার হাতেখড়ি। একদিন ভোলা একটা আস্ত কবিতা লিখে অবাক করে দেয় সবাইকে। ভোলার সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বলাইচাঁদ লেখেন 'ময়ূর' নামের একটি কবিতা। কবিতাটি লেখা হয়েছিল ***পয়ার ছন্দে***। বনফুলের লেখা এই প্রথম কবিতাটি কেমন ছিল, আমাদের তা জানার উপায় নেই। বনফুলের জীবনীতে এই কবিতাটির কথা রয়েছে। কিন্তু কবিতাটি রক্ষিত হয়নি। মাইনর ক্লাসের পরীক্ষায় পূর্ণিয়া জেলায় প্রথম হন বলাইচাঁদ।

পয়ার ছন্দ ঃ চোদ্দ অক্ষরের মিত্রাক্ষৰ ছন্দ। বাংলা কবিতা গোড়া থেকেই এই ছন্দের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট। বাংলা মহাভারত এই ছন্দে লেখা। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই ছন্দে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা হয়েছে।

মাইনর ক্লাসের পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে পাশ করার পর বলাইচাঁদ ভর্তি হলেন সহেবগঞ্জ রেলওয়ে হাইস্কুলে। গঙ্গার এপারে মণিহারী ওপারে সাহেবগঞ্জ। যাতায়াত করতেন স্টিমারে চেপে। ১৯৬৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ আরম্ভ হল। বলাইচাঁদ তখন ফোর্থ ক্লাসের ছাত্র। যুদ্ধের জন্য বন্ধ হয়ে গেল স্টিমার চলাচল। যাতায়াতের একমাত্র ভরসা হয়ে দাঁড়াল নৌকা। বাড়ি ও হস্টেলে যাতায়াতের পথে গঙ্গার বুকে এই জলযাত্রা প্রাণভরে উপভোগ করতেন বলাইচাঁদ।

সাহেবগঞ্জ স্কুলে এসে পড়াশোনায় বলাইচাঁদের সুনাম অক্ষুণ্ণই থাকল। এই স্কুলে তিনি

যতদিন পড়েছেন, বরাবর প্রথম হয়েছেন। পড়াশোনার পাশাপাশি লেখালেখির প্রতি উৎসাহ এই পর্বে প্রবল হয়ে উঠল। এখন তিনি সাহেবগঞ্জ বোর্ডিংয়ের আবাসিক ছাত্র। ঠিক করলেন হাতে লেখা মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করবেন। নাম দিলেন— 'বিকাশ'। এই পত্রিকার প্রায় সমস্ত লেখার পিছনে ছিলেন বলাইচাঁদ। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ধাঁধা, অনুবাদ, সম্পাদকীয় মন্তব্য একাধারে সব লেখাই লিখতেন তিনি। 'বিকাশ'-এর একজন গুণগ্রাহী পাঠক ছিলেন জনৈক বটুকদা। এই বটুকদার উৎসাহে ১৯৬৫ সালে কলকাতার কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সম্পাদিত 'মালঞ্চ' পত্রিকায় বলাইচাঁদের স্বনামে ছাপার অক্ষরে প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয়। এই ঘটনায় সবাই খুশি হলেন, কিন্তু মোটেই খুশি হলেন না হেডপণ্ডিত মশাই। তাঁর মতে অল্প বয়সে সাহিত্যের নেশা মাথায় চাপলে পড়াশোনা গোল্লায় যাবে। 'মালঞ্চ'-তে কবিতা ছাপা হওয়ার হেডপণ্ডিতের তিরস্কার জুটল বলাইচাঁদের কপালে। নিরুৎসাহ হয়ে পড়লেন বলাইচাঁদ। বটুকদা এগিয়ে এসে ছদ্মনাম গ্রহণের পরামর্শ দিলেন। বলাইচাঁদের জীবনে শুরু হল এক নতুন অধ্যায়।

আপনাদের করণীয় — ৭.১

নীচের প্রশ্নগুলির অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে উত্তর লিখুন—

(ক) বনফুলের জীবনে কাকা চারুচন্দ্রের প্রভাবের দিকটি আলোচনা করুন।

(খ) পারিবারিক পরিমণ্ডল বনফুলের সাহিত্যকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে —আলোচনা করুন।

(গ) ছদ্মনাম নেওয়ার সময় বলাইচাঁদ কেন 'বনফুল' শব্দটিকে বেছে নেন— আলোচনা করুন।

'বনফুল' ছদ্মনাম নিলেন বলাইচাঁদ। গ্রামের পরিবেশে বড় হওয়া বলাইচাঁদের কাছে বন ও ফুল এই দুইয়েরই প্রভাব ছিল খুব। বলাইচাঁদের বয়স যখন পাঁচ-ছয় বছর, একবার একা একা চলে গিয়েছিলেন বাড়ির পাশের পীরবাবার জঙ্গলে। আত্মজীবনীতে বলাইচাঁদ তার ছদ্মনাম গ্রহণের বিষয়টি অত্যন্ত সুন্দর করে লিখেছেন— 'ছেলেবেলার ভৃত্য মহলে আমার নাম ছিল জংলীবাবু। বনজঙ্গল আমি খুব ভালোওবাসি। বাল্যকালে অনেক কীটপতঙ্গ প্রজাপতির পিছনে ঘুরিয়াছি। পরিণত বয়সেও পাখী চিনিবার জন্য অনেক জঙ্গলে ঘুরিতে হইয়াছে। বন চিরকালই আমার নিকট রহস্য নিকেতন। এইজন্যই বোধহয় ছদ্মনাম নির্বাচনের সময় 'বনফুল' নামটা আমি ঠিক করিলাম।' (*পশ্চাৎপট*, পৃঃ ৪৪)। বনফুল ছদ্মনামে বলাইচাঁদের প্রথম কবিতাটি প্রকাশিত হল ১৩২৪ বঙ্গাব্দে। কুচবিহারের রানি নিরূপমা সম্পাদিত 'পরিচারিকা' পত্রিকায় প্রকাশিত সেই কবিতাটির নামছিল 'উষা'। পরের বছর ওই একই পত্রিকায় প্রকাশিত হয় বনফুলের আরো দুটি কবিতা, 'দুর্বা' ও 'প্রদীপ'। সেসময় বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির ভিতর সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিল 'প্রবাসী' পত্রিকা। এই পর্বে বনফুল সেখানেও বেশ কিছু কবিতা পাঠিয়েছিলন। কিন্তু সবকয়টি কবিতাই অমনোনীত হয়ে ফেরৎ আসে। কিশোর বনফুল কিন্তু মনোবল হারালেন না। কবিতা

লেখা এবং প্রকাশের জন্য পাঠানো চলতে থাকল সমান উৎসাহে।

১৯১৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষা পাশ করেন বনফুল। এবার তাঁকে সাহেবগঞ্জ ছাড়তে হল পরবর্তী পড়াশোনার জন্য। সাহেবগঞ্জ ছেড়ে হাজারীবাগের সেণ্ট কলম্বাস কলেজে ভর্তি হলেন আই এস সি পড়ার জন্য। কিন্তু সাহেবগঞ্জ তাঁর জীবনে দাগ কেটে রইল। সাহেবগঞ্জের বোর্ডিং, বটুকদা, নীলকুঠি, ঝর্ণা, পাহাড়তলী ইত্যাদি বনফুলের কিশোর বয়সের স্মৃতিতে উজ্জ্বল হয়ে রইল।

হাজারীবাগের চারদিকে অরণ্য আর পাহাড় দিয়ে ঘেরা। এই পরিবেশ উপভোগ করতেন বলাইচাঁদ। কলেজের মিশনারি অধ্যাপকদের খ্রিষ্টীয় পরিমণ্ডল বলাইচাঁদের ভাবনা ও কল্পনার জগতে নতুন রং লাগাল। ছোটবেলা থেকে বই পড়ায় প্রবল আগ্রহছিল বনফুলের। সাহেবগঞ্জে থাকাকালীনই বলাইচাঁদের মাতৃভাষার সেরা সাহিত্যগুলি পড়া হয়ে গিয়েছিল। ওই পর্বেই পড়েছিলেন ডিকেন্স, স্কট, থ্যাকারে প্রমুখ বিদেশী সাহিত্যিকের সাহিত্য। হাজারীবাগে এসে বই পড়ার পরিধিটা আরও অনেক বড় হয়ে গেল। ***সেক্সপিয়র,*** মিল্টন, হুগো, টলস্টয় প্রমুখের উৎকৃষ্ট সাহিত্যের সঙ্গে হাজরীবাগ লাইব্রেরির সুবাদে তাঁর গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। সাহেবগঞ্জে থাকাকালীন একবার সেসময়ের বিখ্যাত পত্রিকা 'প্রবাসী'তে প্রকাশের জন্য কবিতা পঠিয়েছিলেন বলাইচাঁদ। ছাপা হয়নি। অবশ্য হাজারীবাগের কলেজজীবনের শেষ দিকে সাহিত্যিক হিসাবে তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। প্রতিষ্ঠা আসে সেই 'প্রবাসী' পত্রিকার হাত ধরেই। ১৯২০ সালে পরপর দুমাসে *প্রবাসী*র পাতায় বনফুলের দুটি কবিতা ছাপা হয়। কবিতাদুটির নাম যথাক্রমে 'নাছোড়বান্দা' ও 'সুবুদ্ধি'। দুটিই সংস্কৃত কবিতার অনুবাদ।



সেক্সপিয়র ঃইংরেজি সাহিত্যের মহান কবি ও নাট্যকার। জন্ম-১৫৬৪, মৃত্যু-১৬১৬। ওথেলো, ম্যাকবেথ, কিংলিয়র, জুলিয়াস সিজার ইত্যাদি তাঁর অতি বিখ্যাত নাটকগুলির অন্যতম।

১৯২০ সালে ইণ্টারমিডিয়েট পাশ করার পর ডাক্তারি পড়ার জন্য বনফুল কলকাতা যান। মেডিক্যাল কলেজে ভর্তি হবার প্রথম দিনের অভিজ্ঞতা বনফুল তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন। বর্ণনাটি চিত্তাকর্ষক— প্রথম দিন আধ ময়লা ধুতি-পাঞ্জাবি এবং তালিমারা জুতো পরে কলেজে উপস্থিত হলে কলেজের সুবেশ কেতাদুরস্ত দারোয়ান প্রিন্সিপালের সঙ্গে দেখা না করিয়ে তাঁকে বসিয়ে রাখেন। প্রায় আধঘণ্টা বসে থাকার পর ভাগ্যক্রমে বনফুলের দেখা হয় অনাদিবাবু নামে জনৈক পূর্বপরিচিতের সঙ্গে। অনাদিবাবু তখন সেখান থেকে বনফুলকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে, নাপিত ডাকিয়ে 'দশআনা-ছয়আনা' চুল কাটিয়ে, শহুরে পোশাকে বনফুলকে আবার কলেজে নিয়ে আসেন। মেডিক্যাল কলেজের সে সময়ের অধ্যক্ষ হাজারীবাগ কলেজের অধ্যক্ষের বাল্যবন্ধু ছিলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে বনফুলের ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন। হাজারীবাগ কলেজের অধ্যক্ষ কার সাহেব বনফুলের দরখাস্তের উপর প্রশংসাসূচক কয়েকটি কথা লিখে দিয়েছিলেন।

কলকাতায় প্রথম দিকে বনফুল কিছুদিন শেওড়াফুলির মামা বাড়িতে থেকে মেডিক্যাল কলেজে যাতায়াত করতেন। সেসময়ে মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রদের জন্য হোস্টেলের ব্যবস্থা ছিল না। বনফুল প্রথমে তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে, পরে কলেজের কাছে ইণ্টারন্যাশনাল বোর্ডিং এবং তার পরে বৌবাজারের ডায়মণ্ড বোর্ডিং হাউসে থেকে পড়াশোনা করতেন।

মণিহারী থেকে সাহেবগঞ্জ, তারপর হাজারীবাগ হয়ে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বসবাস— এভাবেই অভিজ্ঞতা বাড়ছিল বনফুলের। সেইসঙ্গে ধীরে ধীরে বাড়ছিল সাহিত্যিক হিসাবে তার সুনামও।

কলকাতা বাসের প্রথম দুবছর বনফুল মূলত কবিতা, বিশেষ করে ***ব্যঙ্গকবিতাই*** রচনা করেছেন। অন্যান্য পত্রিকার সঙ্গে এই পর্বে বনফুলের কবিতা ছাপা হয় 'ভারতী' ও 'কল্লোল'-এর মতো সমৃদ্ধ পত্রিকাতেও। মেডিক্যাল কলেজে পড়ার সময়ই তাঁর সঙ্গে পরিচয় ঘটে কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের।

আসুন জেনে নিই...

সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলা ভাষার বিখ্যাত কবি। 'ছন্দের জাদুকর' বিশেষণে প্রসিদ্ধ। জন্ম ১৮৮২ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি, মৃত্যু ১৯২২ সালের ২৫ জুন। ইনি অক্ষয় কুমার দত্তের পৌত্র। ১৮ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'সবিতা'। 'তীর্থসলিল', 'অভ্র-আবীর', 'কুহু ও কেকা' তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম। তাঁর কবিতায় বাংলা ছন্দের বিভিন্ন প্রয়োগ পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রবীন্দ্র-অনুসারী কবিদের মধ্যে তিনি অন্যতম।

১৮৯৯ থেকে ১৯২৬ পর্যন্ত বনফুলের জীবনের এই পর্বটিতে আমরা দেখলাম একটি শিশু যৌথ পরিবারে জন্মে প্রাকৃতিক পরিবেশে ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠছে, গ্রাম থেকে এসে পৌছচ্ছে শহরে, স্কুল কলেজের পড়াশোনার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে তার সাহিত্য পাঠের জগৎ এবং সেই শিশু ধীরে ধীরে কবি হয়ে উঠছেন। ১৯২২ সাল পর্যন্ত বনফুলের সাহিত্যিক পরিচয় কবির পরিচয়। ১৯২২-এ এসে বনফুলের সাহিত্যিক পরিচয়ে অন্য একটি ধারা যুক্ত হবে— রের পরিচয়।



কবিতা লিখতে লিখতে হঠাৎই গল্প লিখতে আরম্ভ করেন বনফুল। গল্প লেখার শুরুর বিষয়ে বনফুল তাঁর ***আত্মজীবনী*** 'পশ্চাৎপট'-এ লিখেছেন— "মেডিক্যাল কলেজে আমি অনেক সময় খালি ক্লাসরুমে বসিয়া থাকিতাম। প্রকাণ্ড ঘরে নির্জন গ্যালারীতে বসিয়া থাকিতে খুব ভাল লাগিত। নির্জন পরিবেশ না হইলে আমি লিখিতে পারি না। মেডিক্যাল কলেজে খালি ক্লাসরুমগুলিতেই সেই নির্জনতা পাইতাম। একদিন 'বাড়তি-মাশুল', 'অজান্তে' প্রভৃতি চার-পাঁচটি গল্প একসঙ্গে লিখিয়া ফেলিলাম। লিখিবার পর মনে হইল এগুলি গল্প হইল তো? 'প্রবাসী'তেই সব গল্পগুলি পাঠাইয়া দিলাম।" আত্মজীবনীতে বনফুল গল্পগুলির নাম উল্লেখ করেছেন বটে, আসলে কোনো নামকরণ ছাড়াই তিনি গল্পগুলি পাঠিয়েছিলেন 'প্রবাসী'তে। গল্পগুলির নাম পত্রিকা সম্পাদকের দেওয়া। সে যা হোক, ছাপার অক্ষরে বনফুলের প্রথম গল্পটি প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী'র আশ্বিন ১৩২৯, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ষষ্ঠ সংখ্যায়। গল্পটির নাম ছিল— 'চোখ গেল'। অবশিষ্ট গল্পগুলি পরের মাস থেকে পরপর প্রকাশিত হয় ওই একই পত্রিকায় 'বাড়তি-মাশুল', 'আত্মপর' ও 'অজান্তে' নামে।

বনফুল ছিলেন চির-কৌতূহলী। গ্রামের সহজ সরল অথচ গভীর জীবনবোধ নিয়ে তিনি ব্যস্ত নগরকে দেখেছেন অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে। আত্মজীবনীতে তিনি এক জায়গায় লিখেছেন— 'আমি সে সময় অবসর পাইলেই রাস্তায় ঘুরিতাম'। শুরুতে কিছুদিন রেল-এ যাতায়াত ও পরে



ব্যঙ্গকবিতা ঃ পরিহাসপ্রবণ কবিতা, কোনো ব্যক্তি বা ঘটনার প্রতি উপহাসই এধরনের কবিতা রচনার মূল উদ্দেশ্য। প্রধানত এই কবিতাগুলি সমাজসংস্কারের উদ্দেশ্য নিয়েই লেখা হত।

আত্মজীবনী ঃ নিজ জীবনবৃত্তান্ত। এই ধরনের লেখায় কেন্দ্রীয় চরিত্র লেখক নিজেই। কোনো আড়াল না রেখে নিজের জীবনকাহিনি পাঠকের সামনে মেলে ধরার কাজটি অত্যন্ত কঠিন, তবু সব দেশে সব যুগেই আত্মজীবনী লিখেছেন বিশিষ্টজনেরা।

কলকাতার পথে পথে নাগরিক জীবনকে নতুন চোখে তিনি যেভাবে আবিষ্কার করেন; বোধহয় তার ভিতরেই লুকিয়ে ছিল তাঁর গল্পকার হয়ে ওঠার বীজ।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ বনফুল-এর প্রকৃত নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ বনফুলের বাবার নাম কী? তাঁর পেশা কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ বনফুলের প্রকাশিত হাতে লেখা পত্রিকাটির নাম কী ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ বনফুলকে ছদ্মনাম নেওয়ার পরামর্শ কে দেন?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ ছাপার অক্ষরে বনফুলের প্রকাশিত প্রথম ছোটগল্পের নাম কী? কোন পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল?

.....

মেডিক্যাল কলেজে পড়ার শেষদিকে বনফুলের সঙ্গে পরিচয় হয় 'শনিবারের চিঠি'-র সম্পাদক সজনীকান্ত দাসের। তখনও সজনীকান্ত দাসের সম্পাদিত পত্রিকাটির সঙ্গে ভালেকরে পরিচয় ছিল না বনফুলের। হঠাৎই একদিন 'প্রবাসী'-র দপ্তরে সজনীকান্তের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। এই সজনীকান্ত দাসই পরবর্তীকালে হয়ে ওঠেন বনফুলের সাহিত্যিক জীবনের অন্যতম প্রেরণা। সজনীকান্তের অনুরোধেই 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত হয় বনফুলের প্রথম প্রবন্ধ 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যে ***করুণ রস***'। অবশ্য লেখাটি ছাপা হয়েছিল বনফুলের নাম-স্বাক্ষর ছাড়া।

করুণ রস ঃ শোক নামক স্থায়ী ভাব থেকে করুণ রসের জন্ম হয়। শৃঙ্গার ও হাস্য রস করুণ রসের বিরোধী। বাংলা সাহিত্যে করুণ রসের প্রাধান্য বেশি।

১৯২৬ সালে বিহার সরকার পাটনায় মেডিক্যাল কলেজ স্থাপন করে। বিহারের যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে পড়ছিলেন, তাঁদের পাটনায় স্থানান্তরিত করা হয়। সরকারী নির্দেশ মর্মে বনফুলকেও চলে যেতে হল পাটনায়। এম বি বি এস-এর শেষ পরীক্ষা তিনি সেখান থেকেই দেন। সেদিক দিয়ে বনফুল পাটনা মেডিক্যাল কলেজের প্রথম পরীক্ষার্থীদলের স্নাতকদের একজন। সেসময় পাটনা মেডিক্যাল কলেজের নিজস্ব প্রসূতি বিভাগ না থাকায় বিহার সরকার ব্যাঙ্গালোরের ভিক্টোরিয়া হাস্পাতালে ছাত্রদের পড়ানোর ব্যবস্থা করে। সে সূত্রে এক মাসে দক্ষিণ ভারতে বসবাসের অভিজ্ঞতাও হয় বনফুলের। বাঙ্গালোরে থাকাকালীন স্কটল্যাণ্ডবাসী এক নার্সের সঙ্গে অন্তরঙ্গতা হয় বনফুলের। অবশ্য সে অন্তরঙ্গতা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

বাঙ্গালোর থেকে ফেরার কিছুদিন পরই ১৯২৭ সালের জুন মাসে চিন সীমান্তের কাছাকাছি মিচিনা শহর নিবাসী উকিল গোপাল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে লীলাবতীর সঙ্গে বিয়ে হয় বনফুলের। বিয়ের পরপরই ডাক্তারির শেষ পরীক্ষা এবং ওই একই বছর ডাক্তারির ডিগ্রি লাভ

করেন বনফুল। কিছুদিন পরই পাটনা মেডিক্যাল কলেজের জুনিয়র হাউস সার্জেন হিসাবে মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও সেখানকার আত্মসম্মানহানিকর প্রথা মেনে নিতে না পারায় চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতায় ফিরে ফিজিওলজির ডেমনস্ট্রেটর ডাক্তার চারুব্রত রায়ের কাছে ক্লিনিক্যাল প্যাথোলজিতে স্পেশাল ট্রেনিং নিতে আরম্ভ করেন। ভালো চাকরি ছেড়ে ল্যাবরেটরি প্র্যাকটিসকেই জীবিকা হিসাবে বেছে নেওয়ার এই সিদ্ধান্তের পিছনে বনফুলের একটি কারণ ছিল। আত্মজীবনীতে এপ্রসঙ্গে বনফুল লিখেছেন— 'আমি সাহিত্যচর্চা করতে চাই। ল্যাবরেটারী প্র্যাকটিস করলে তারজন্য সময় পাব। চাকরী করলে তা পাব না। জেনারেল প্র্যাকটিস করলেও তা সম্ভব নয়।' —বনফুলের এই সিদ্ধান্ত থেকে সাহিত্যসাধনায় তাঁর ইচ্ছার তীব্রতা বুঝে নিতে আপনাদের নিশ্চয় অসুবিধা হবে না।

প্যাথলজি শিক্ষা গ্রহণের একবছর অত্যন্ত নিষ্ঠা ও শ্রমের সঙ্গে তিনি ক্লিনিক্যাল প্যাথলজিতে যুক্ত হয়েছিলেন। সকাল দশটা থেকে রাত নটা পর্যন্ত ল্যাবরেটরিতে কাটানোর পর রাতে শুতে আসতেন তিন নম্বর মির্জাপুর স্ট্রিটের মেসে। এ-সময় স্ত্রী লীলাবতী দেবী আই-এ পড়ারজন্য বেথুন কলেজের হোস্টেলে থাকতেন। নতুন বিবাহিত জীবন ও নতুন পড়াশোনার চাপে এই সময় বনফুলের সাহিত্য সাধনা বাধাপ্রাপ্ত হয়। বনফুল নিজেও জানিয়েছেন— 'আমার সাহিত্যেও একটা নতুন মোড় ঘুরিল। লীলা হোস্টেলে চলিয়া গেল। প্রেমপত্র ও প্রেমের কবিতা লিখিতে শুরু করিলাম। পরিমল তাহার স্মৃতিচারণে লিখিয়াছে যে এই সময়টা আমি সাহিত্যচর্চা হইতে বিরত ছিলাম। মোটেই বিরত ছিলাম না, কিন্তু যে সাহিত্য আমি রচনা করিয়াছিলাম তাহা মাসিকপত্রে প্রকাশযোগ্য ছিল না। তাহা লীলার নিকট প্রেরিত হয় এবং সে তাহা বাক্সে বন্ধ করিয়া রাখিয়া দিত।' একথা ঠিক যে ওই একবছর বনফুল কেবল প্রেমপত্র এবং প্রেমের কবিতাই লিখেছেন। তবে সাহিত্যচর্চার বিরতি এই পর্বে এক বছরের নয়। পরবর্তী পাঁচ-ছয় বছর বনফুল প্রায় কিছুই লেখেননি। এর কোনো প্রত্যক্ষ কারণ জানা যায় না। কোনো এক অজানা কারণে তিনি সাহিত্য রচনার সহজ প্রেরণা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিলেন।

প্যাথোলজি শিক্ষা শেষ করে ১৯২৯ সাল নাগাদ মেডিক্যাল অফিসারের চাকরি নিয়ে মুর্শিদাবাদ জেলার আজিমগঞ্জের মিউনিসিপালিটি হাস্পাতালে চলে যান বনফুল। আজিমগঞ্জে ছিলেন এক বছর। এখানে তাঁর প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। আজিমগঞ্জবাসের স্মৃতিতে পরবর্তীকালে তিনি রচনা করেন 'নির্মোক' উপন্যাস। একবছর সেখানে থাকার পড় তিনি ভাগলপুরে চলে আসেন। স্বাধীন জীবিকা ও স্থায়ী বসবাসের উদ্দেশ্যে চাকরি ছেড়ে ভাগলপুরের খলিফাবাগ-এ নিজের প্রথম ল্যাবরেটরি স্থাপন করলেন। ল্যাবরেটরির নাম দিলেন— 'The Sero Baetro clinic'.

১৯২৭ থেকে ১৯৩৩ বনফুলের তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো লেখালিখিরই সন্ধান পাওয়া যায় না। সংসার ও জীবিকা এই দুইয়েতেই এই ছবছর ব্যস্ত থাকলেন তিনি। অনেক বিখ্যাত লেখকের জীবনেই সৃষ্টিকর্মে এ-ধরনের খরার কাল লক্ষ্য করা যায়। কেন এমন হয়, তার কোনো যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা দেওয়া মুশকিল। তবে দেখা যায় 'খরা' কেটে যাওয়ার পর লেখকেরা পূর্ণ উদ্যমে ফিরে আসেন লেখালিখিতে। বনফুলের জীবনেও তেমনটাই ঘটেছিল। ১৯৩৩ সালে

পরিমল গোস্বামী বনফুলের ভাগলপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হলেন। পরিমলবাবুর উদ্দেশ্য ছিল লেখককে তাঁর নিজস্ব অজ্ঞাতবাস থেকে টেনে বার করে সৃষ্টিশীল সাহিত্যে ফিরিয়ে আনা। পরিমল গোস্বামী সেসময় 'শনিবারের চিঠি' পত্রিকার সম্পাদক। পত্রিকার প্রয়োজনে লেখক বনফুলের হাতে পুনরায় কলম ধরিয়ে দেওয়া সম্পাদকের উদ্দেশ্য ছিল হয়ত। সুসংবাদ এই যে, পরিমল গোস্বামী তাঁর উদ্দেশ্যে সফল হয়েছিলেন। বনফুল আবার ফিরে আসেন লেখালিখিতে। শুরু হল বনফুলের সাহিত্যের দ্বিতীয় অধ্যায়। ১৩৪০ সনের বৈশাখ সংখ্যায় 'শনিবারের চিঠি'-তে 'ভাদুড়ি' ও 'আশাহত' নামে দুটি কবিতা ছাপা হল। অজস্র ধারায় লিখতে লাগলেন গল্প, কবিতা। 'শনিবারের চিঠি'র জন্য লেখা এই রচনার অধিকাংশই ব্যঙ্গরসাত্মক।

১৯৩৪ সালে বিহারে ভয়াবহ ভূমিকম্প হল। ভেঙে গেল বনফুলের নিজস্ব ল্যাবরেটরি। যন্ত্রপাতি কিছু রক্ষা পেয়েছিল, তাই নিয়ে ভগলপুরে একটি অস্থায়ী ল্যাবরেটরি বানালেন বনফুল। বিপর্যয়ের এই সময় নিজে ভাগলপুরে থাকলেও একরকম বাধ্য হয়েই পরিবারকে পাঠিয়ে দিলেন মণিহারীর বাড়িতেই কিন্তু বিপর্যয়েই তো প্রকৃত বন্ধুর পরিচয় মেলে। বিপদে মানুষই মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান। বনফুল পাশে পেলেন পটলবাবুকে। পেশায় আইনজীবী, কংগ্রেসকর্মী পটলবাবু বনফুলের সাহিত্যিক খ্যাতির সুবাদে তাঁকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন। মূলত পটলবাবুরই ব্যবস্থাপনায় বাসযোগ্য বাড়ি ও ল্যাবরেটরি পেলেন বনফুল। মণিহারীর বাড়ি থেকে ফিরিয়ে আনলেন স্ত্রী ও ভাইকে। ল্যাবরেটরির পরিবেশ অত্যন্ত পছন্দ হয়েছিল বনফুলের। রাত নটা পর্যন্ত সেখানেই থাকতেন তিনি। পেশাগত লাভের জন্য দিনের দীর্ঘ সময় তিনি ল্যাবরেটরিতে কাটাতেন, তেমনটা কিন্তু নয়। বরং পেশার তুলনায় সাহিত্যচর্চাই চলত বেশি হারে।

নতুন ল্যাবরেটরিতে লেখালিখির প্রচুর সময় পেলেন বনফুল। লিখতে আরম্ভ করলেন গদ্য পদ্য মিশ্রিত গল্প 'তৃণখণ্ড', আঙ্গিকের দিক থেকে পুরোপুরি উপন্যাস না হলেও এই লেখার মাধ্যমেই বনফুল উপনাসভূমিতে পা রাখেন। 'তৃণখণ্ড' 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশের জন্য পাঠিয়েছিলেন বনফুল, কিন্তু সম্পাদক পরিমল গোস্বামী তা ছাপতে রাজি হন না। তিনি লেখাটি ফেরত পাঠান। পরে সজনীকান্ত দাসের একান্ত উৎসাহে 'তৃণখণ্ড' সরাসরি বই আকারে প্রকাশিত হয় ১৯৩৬ সালে। একই বছর সরাসরি বই আকারে প্রকাশিত হয় বনফুলের দ্বিতীয় উপন্যাস *বৈতরণী তীরে*। এরপর মূলত উপন্যাস লেখাতেই মন দেন বনফুল। লেখকের ভাষায়— এবার উপন্যাস লিখিবার নেশা আমাকে পাইয়া বসিল।' (*পশ্চাৎপট/বনফুল/*১৩৮৫/পৃঃ ২৩৩)
বই প্রকাশের এই পর্বে প্রকাশিত হয় বনফুলের আরো দুটি বই। একটি কবিতার অন্যটি গল্পের। 'বনফুলের কবিতা' নামের কবিতা সংকলনে ছিল ৮৪টি কবিতা, 'বনফুলের গল্প' নামের গল্প সংকলনে ছিল ৩৪ টি গল্প। এই পর্বে লেখালিখিতে বনফুলের উৎসাহ ছিল প্রবল। লেখার উপযুক্ত সময় হিসাবে তিনি মধ্যরাতকেই বেছে নিয়েছিলেন। নির্জনতা ও মানসিক প্রস্তুতির জন্য এই সময়কেই যথার্থ মনে করতেন। নিয়ম করে সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত একটা পর্যন্ত ঘুমিয়ে নিতেন তিনি। তারপর লেখালিখি চলত ভোর পর্যন্ত। এমনকি ল্যাবরেটরিতেও তিনি লেখার খাতাটি সঙ্গে নিয়ে যেতেন।

একটি বিষয় খেয়াল করে দেখুন, বনফুল যখন লিখছেন রবীন্দ্রনাথ তখন উজ্জ্বলভাবে সাহিত্যের আসরে উপস্থিত। সমকালের প্রায় সমস্ত লেখকদের সঙ্গেই রবীন্দ্রনাথের যোগাযোগ ছিল। কখনো সেই যোগাযোগ ছিল ব্যক্তিগত স্তরে, কখনোবা রচনাকর্মের মাধ্যমে। ১৯৩৬-এর শেষ দিকে অথবা ৩৭-এ প্রথম দিকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের পরিচয় ঘটে। বনফুল তাঁর 'রবীন্দ্র-স্মৃতি' গ্রন্থে এই পরিচয় পর্বের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা সংক্ষেপে এইরকম — কালীঘাটের মন্দিরে ***বলিপ্রথার*** বিরুদ্ধে অনশনে বসেন জনৈক রামচন্দ্র শর্মা। রবীন্দ্রনাথ রামচন্দ্রের উদ্যোগকে সংবর্ধিত করে একটি কবিতা লেখেন। কবিতাটি ছাপা হয় ১৩৪২ সনের অশ্বিন মাসের 'প্রবাসী' পত্রিকায়। রবীন্দ্রনাথের মতো মহৎ চরিত্রের এই সামান্য বিষয়ে কলম চালনা বনফুলের পছন্দ হয়নি। তিনি ওই রবীন্দ্র-কবিতাকে কটাক্ষ করে একটি ব্যঙ্গ কবিতা লেখেন। কবিতাটি ছাপা হয় 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-র বার্ষিক দোল সংখ্যায়। রবীন্দ্রনাথ কবিতাটি পড়েন এবং বনফুলের বিষয়ে উৎসাহিত হন। কবি চিঠি লিখে বনফুলকে শান্তিনিকেতনে আসতে অনুরোধ করেন। কবির আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে বনফুল সপরিবারে শান্তিনিকেতন যান। প্রথম পরিচয়ের সূত্র ছিল এইরকম। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয়ের মুগ্ধতাবোধ বনফুলকে আপ্লুত করে। তিনি এতটাই মুগ্ধ হন যে, তাঁর পরবর্তী উপন্যাস 'কিছুক্ষণ' উৎসর্গ করেন রবীন্দ্রনাথকেই। 'কিছুক্ষণ' বনফুলের লেখা চতুর্থ উপন্যাস।

বলিপ্রথা ঃ দেবতাকে সন্তুষ্ট করতে যজ্ঞ-পূজাদিতে প্রাণীবধ। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথার বিরোধী ছিলেন।

বনফুলের বাড়িতে থিয়েটারচর্চা পরিবেশের কথা আগেই বলেছি। ছোটবেলা থেকেই তি তাঁর একটা টান ছিল। সম্ভবত সেই টানই তাঁকে একসময় নাটক লিখতে অনুপ্রাণিত ৪৪ সনে 'ভারতবর্ষ পত্রিকার আষাঢ়-ভাদ্র সংখ্যায় প্রকাশিত হয় বনফুলের নাটক *রূপান্তর*। এটিই বনফুলের প্রথম প্রকাশিত নাটক।

বনফুলের যাবতীয় লেখালিখিই একান্তভাবে তাঁর মর্জি নিয়ন্ত্রিত। খেয়ালখুশি মতো যখন যা ইচ্ছে হয়েছে তাই লিখেছেন বনফুল। তেমনই একটি রচনা জীবনীনাট্য 'শ্রীমধুসূদন'। ভাগলপুর তেজনারায়ণ জুবিলি কলেজে বাংলার অবৈতনিক শিক্ষক হিসাপে কিছুদিন কাজ করেছিলেন বনফুল। সে সময়কার পাঠ্যক্রমভুক্ত মধুসূদন দত্তের *মেঘনাদবধ কাব্য* পড়াতেন তিনি। পড়াতে পড়াতে মধুসূদনের অন্তরঙ্গ জীবনকথার অভাব অনুভব করে বনফুল কবির জীবন আধারিত নাটক রচনায় উদ্বুদ্ধ হন। লেখেন *শ্রীমধুসূদন* নাটকটি। *ভারতবর্ষ* পত্রিকার ১৩৪৫ সনের আষাঢ় থেকে অগ্রহায়ণ পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয় এই নাটক।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ৬ ঃ বনফুলের স্ত্রীর নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ ১৯২৭ থেকে '৩৩ লেখালিখিতে অন্তবর্তী বিরতির পর কার উৎসাহে বনফুল ফের কলম তুলে নেন?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ 'বনফুলের গল্প' নামের গল্প সংকলনে মোট কয়টি গল্প ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে কোথায় আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ বনফুল তাঁর কোন উপন্যাস রবীন্দ্রনাথকে উৎসর্গ করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ মধুসূদন দত্তের জীবন-অবলম্বনে লেখা বনফুলের জীবনীটার নাম কী?

.....

বৈচিত্র্যপ্রিয়তা ছিল বনফুলের স্বভাবের অঙ্গ। সেই প্রেরণা থেকেই তিনি লেখেন 'জঙ্গম' উপন্যাস। এটি বনফুলের সর্ববৃহৎ উপন্যাস। ১৩৪৬ সনের আষাঢ় থেকে ১৩৫৬ সনের কার্তিক মাস পর্যন্ত 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে একটানা প্রকাশিত হয় এই উপন্যাস।

১৯৪৬ সালে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু এবং ১৯৪২ সালের আন্দোলন এই দুই ঘটনা বনফুলকে গভীরভাবে আলোড়িত করেছিল। বনফুল তাঁর 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে জানিয়েছেন যে, কবির ইচ্ছা ছিল বনফুলের কলমে নিজের জীবনের নাট্যরূপ দেখা। কবির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে তিনি লেখেন একাঙ্ক নাটক 'অন্তরীক্ষে'। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর শনিবারের চিঠির বিশেষ সংখ্যায় (আশ্বিন, ১৯৪৬) প্রকাশিত হয় নাটকটি। আর '৪২-এর আন্দোলনের প্রভাবে বনফুল লেখেন 'অগ্নি' নামের উপন্যাস।

আসুন জেনে নিই....

মেঘনাদবধ কাব্য বাংলা ভাষার একমাত্র সার্থক মহাকাব্য। ১৮৬৬ সালে মাইকেল মধুসূদন দত্ত এই কাব্য রচনা করেন। ধ্রুপদী মহাকাব্য রামায়ণের কাহিনি পুনর্বিন্যস্ত করে মাইকেল এই সাহিত্যিক মহাকাব্য রচনা করেন। এই কাব্যের নায়ক রামচন্দ্র নন, রাবণ। মানবতাবাদীর দৃষ্টিতে মধুসূদন এই কাব্যে রাবণকে বীর চরিত্র হিসাবে এবং রামচন্দ্রকে দেবতার কৃপাপ্রার্থী এক দুর্বল চরিত্র হিসাবে দেখিয়েছেন। কাব্যটি নয়টি সর্গে বিন্যস্ত। বীরবাহুর মৃত্যু সংবাদে এই কাব্যের আরম্ভ ও মেঘনাদের মৃত্যু পরবর্তী সৎকারকর্মের বর্ণনায় কাব্যটি সমাপ্ত হয়েছে। মেঘনাদবধ মধুসূদনের সবচেয়ে উজ্জ্বল রচনা।

ভারত ছাড়ো আন্দোলন — 'ক্রিপস মিশন' ব্যর্থ হ'লে জাপানি আক্রমণ থেকে ভারতকে রক্ষা করতে ব্রিটিশদের ভারত ত্যাগের দাবি ওঠে। ১৯৪২ সালের ১৪ জুলাই কংগ্রেস কার্যনির্বাহী সমিতি 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের ডাক দেয়। ৭ আগস্ট নিখিল ভারত কংগ্রস কমিটির বৈঠকে অহিংস গণ আন্দোলন চলাবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধিজি

'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে' নীতি ঘোষণা করেন। ৮ আগষ্ট গভীর রাতে গান্ধিজি, জওহরলাল, বল্লভভাই প্যাটেল সহ অন্যান্য নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। পরদিন নেতাদের গ্রেপ্তারের খবর প্রচারিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেশময় হরতাল, বিক্ষোভ, মিছিল, ভাঙচুর আরম্ভ হয়। আন্দোলন আর অহিংস থাকে না। আন্দোলনকারীদের রোষের মুখে রেলস্টেশন, ডাকঘর, টেলিগ্রাম ও টেলিফোন পরিষেবা বিপুল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুর চলতে থাকে দেশজুড়ে। আন্দোলন দমনে নির্বিচারে গুলি, লাঠি, গ্রেপ্তার, জরিমানা চলতে থাকে পুলিশি তৎপরতায়। এই আন্দোলনে প্রাণ হারান এক হাজারেরও বেশি মানুষ, বন্দি হন ষাট হাজার মানুষ। সরকারি দমননীতির ব্যাপকতায় ১৯৪২ এর সেপ্টেম্বরের মধ্যেই এই আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। ভারত ছাড়ো আন্দোলন 'আগস্ট আন্দোলন' ও '৪২-এর আন্দোলন' নামেও পরিচিত।

অধ্যাপক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'কালের প্রতিমা গ্রন্থে বনফুল সম্পর্কে বলেছেন— 'বনফুল মূলত জীবন সম্পর্কে অশ্রান্ত কৌতূহলী। তাঁর কৌতূহল জীবনের সকল ক্ষেত্রে— ইহলৌকিক, পরলৌকিক, বস্তুলোক, স্বপ্নলোক, বিজ্ঞানদর্শন, কাব্যইতিহাস, বাস্তব জীবন ও অন্তরলোক —সর্বত্রই তাঁর সমান কৌতূহল।' —এই কৌতূহলই রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'কৌতূহলের রস' তবে বনফুল সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের প্রযুক্ত মৌলিক বিশেষণটি হল— 'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'। —'জগতের আনাচে-কানাচে আড়ালে-আবডালে ধূলি-ধূসর হয়ে আছে যারা তুচ্ছতার মূল্যেই তাদের মূল্যবান করে দেখানোর কাজে কোমর বেঁধে বেরিয়েছে তোমাদের মতো বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক।' (বনফুল/রবীন্দ্রস্মৃতি/পৃঃ ৩৮)

বিচিত্ররকম বিষয়ে অদ্ভুত কৌতূহল বনফুলের লেখার সত্যিই একটি উল্লেখযোগ্য দিক। আপনারা জানেন যে 'বনফুল' লেখকের ছদ্মনাম। এই ছদ্মনামটিই যেন লেখকের পিতৃদত্ত নামকে আড়াল করে রেখেছে। উল্লেখযোগ্য তথ্য হলো 'বনফুল' ছাড়াও লেখকের আরো কয়েকটি ছদ্মনাম ছিল। এমন দুটি ছদ্মনামের উল্লেখ রয়েছে পরিমল গোস্বামীর 'যখন সম্পাদক ছিলাম' শীর্ষক বইতে— বৃহন্নলা বসাক ও শ্রীবলভদ্র কথক।

গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটকের পাশাপাশি বনফুল প্রবন্ধ রচনাতেও সমান উৎসাহী ছিলেন। 'মনন', 'শিক্ষার ভিত্তি', 'দ্বিজেন্দ্র দর্পণ', বনফুলের কয়েকটি প্রবন্ধ গ্রন্থের নাম। তাঁর সাহিত্যখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ার পর পাঠকের অসংখ্য চিঠিপত্র পেতে আরম্ভ করেন তিনি। সেইসব চিঠিতে পাঠকের বিভিন্ন প্রশ্ন থাকত। প্রশ্নের উত্তর চিঠির আকারে না লিখে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ লিখতে আছম্ভ করেন বনফুল। ১৩৫৫ সনের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা থেকে ১৩৫৬ সনের শ্রাবণ সংখ্যা পর্যন্ত সাপ্তাহিক 'দেশ' পত্রিকার বিভিন্ন সংখ্যায় 'উত্তর' শিরোনামে প্রকাশিত হয় প্রবন্ধগুলি। প্রবন্ধগুলির নাম থেকে লেখকের বৈচিত্র্যপ্রিয়তার আন্দাজ পাওয়া যায়। কয়েকটি প্রবন্ধের নাম এখানে তুলে দেওয়া হল— 'ধর্ম', 'আর্ট', 'যন্ত্র-মহিমা', 'বেকার-সমস্যা', 'সিনেমা-প্রসংগ', 'সাহিত্যপ্রসঙ্গ' ইত্যাদি।

অনুবাদ সাহিত্যে বনফুলের অবদান কিছু কম নয়। পাশ্চাত্যের ক্লাসিক সাহিত্যের প্রতি তাঁর অনুরাগ ছিল ছেলেবেলা থেকেই। বনফুলের অনুবাদে ছয়টি উপন্যাস ও একটি নাটকের

সন্ধান পাওয়া যায়। বেন ট্রেডার্স-এর 'এ কাক্কু ইন দ্য নেস্ট' অবলম্বনে 'ভীমপলশ্রী', আনাতোল ফ্রাঁস-এর 'থেইস' অবলম্বনে 'নিরঞ্জনা', দস্তয়ভস্কির 'দ্য ইণ্টারনাল হাজব্যাণ্ড' অবলম্বনে 'নঞ-তৎপুরুষ', আর এল স্টিভেনসনের 'প্রিন্স অটো' অবলম্বনে 'গন্ধরাজ', চেকভের 'ওয়ার্ড নাম্বার সিক্স' অবলম্বনে 'সীমারেখা', ডিকেন্সের 'ক্রিসমাস ক্যারল' অবলম্বনে 'পীতাম্বরের পুনর্জন্ম' এবং ক্লিফোর্ড ব্যাক্সের 'পোয়েটেস্টার্স অফ ইস্পাহান' অবলম্বনে 'কবয়' বনফুলের অনুবাদকর্মের নিদর্শন। অনুবাদের নাম থেকেই স্পষ্ট যে কোনো অনুবাদই আক্ষরিক অনুবাদ ছিল না। বিদেশী সাহিত্যের ভারতবর্ষীয় প্রেক্ষাপটে রূপান্তর করেছিলেন বনফুল।

বনফুলের জীবনের শেষ দশ বছরের ঘটনাপ্রবাহে এবারে নজর দেওয়া যাক। দীর্ঘ ৩৮ বছর ভাগলপুরে বসবাসের পর ১৯৬৮ সালে বনফুল আবার কলকাতায় ফেরেন। ততদিনে ছেলেমেয়েরা নিজের নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে কাজের টানে দূরে সরে গেছেন। ছেলেমেয়েদের অনুপস্থিতিতে পত্নী লীলাবতির জীবনে নিঃসঙ্গতা বাসা বাঁধতে আরম্ভ করেছে। অন্যদিকে ডাক্তারি ও সাহিত্যচর্চা একই সঙ্গে চালিয়ে যাওয়া, সময়ের অভাবে একপ্রকার অসম্ভব হয়ে উঠেছিল বনফুলের কাছে। ভাগলপুরে থাকলে রোগী দেখার হাত থেকে নিস্তার নেই জেনে বনফুল ভাগলপুর ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেন। সেই সঙ্গে ডাক্তারি প্র্যাকটিশও ছাড়েন।

শেষ পর্বের লেখালিখির ভিতর বনফুলের উল্লেখযোগ্য রচনা হলো আত্মজীবনী 'পশ্চাৎপট' ও ডায়রি জাতীয় রচনা 'মর্জিমহল'।

প্রায় ৫০ বছর যৌথ জীবন যাপনের শেষে ১৯৭৫ সালে বনফুলের স্ত্রী লীলাবতি মারা যান। স্ত্রীর মৃত্যু বনফুলের জীবন ও সাহিত্যে এক অদ্ভুত শূন্যতা এনে দেয়। লীলাবতি ছিলেন বনফুলের সমস্ত রচনার প্রথম পাঠক ও সমালোচক। বাংলা ও ইংরাজি সাহিত্যে লীলাবতির জ্ঞান ছিল বিস্তৃত। অনুভূতিপরায়ণ লীলাবতির পরামর্শে বনফুল অনেক লেখার পরিবর্তন করেছেন বলে জানা যায়। তাছাড়া সংসার জীবনে বনফুল একান্তভাবেই ছিলেন লীলাবতির উপর নির্ভরশীল। স্ত্রীর মৃত্যুর পর তিন বছর বেঁচেছিলেন বনফুল। ১৯৭৯ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি কলকাতার বাড়িতে তাঁর মৃত্যু হয়।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১২ ঃ বনফুলের লেখা সুবৃহৎ উপন্যাসটির নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর কবির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বনফুল কোন নাটক লেখেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ রবীন্দ্রনাথ বনফুলকে কোন বিশেষণে ভূষিত করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ 'বনফুল' ছাড়া বলাইচাঁদের আরো দুটি ছদ্মনাম লিখুন।

.....

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ বনফুলের জন্ম ও মৃত্যুর সাল উল্লেখ করুন।

.....

৭.৪ জাগ্রত দেবতা

এক

মন্দিরটি যদিও জীর্ণ, আশেপাশে কচুবন, ঘেঁটুবন, দিনান্তে মহাদেবের মাথায় এক ফোঁটা জল পড়ে কিনা সন্দেহ, মহাদেব কিন্তু জাগ্রত। সনাতনপুরের মহাদেবের নাম শোনে নাই কে? জাগ্রত মহাদেবের নানা কাহিনী আবাল-বৃদ্ধবনিতা সকলেই জানে। বিপিন চৌধুরী এই মহাদেবের নিকট মানত করিয়াই মকদ্দমায় জিতিয়াছেন এবং অত বড় বিরাট সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। পালেদের বাড়ির ছেলেটা টাইফয়েডে তো প্রায় শেষ হইয়া গিয়াছিলই, এই মহাদেবের দ্বারে ধরনা দিয়াই তাহার মা তাহাকে মৃত্যুর মুখ হইতে ফিরাইয়া আনিতে পারিয়াছে। মুকুজ্জেদের যে আজকাল এত বাড়-বাড়ন্ত, তাহাও এই মহাদেবের কৃপায়! মহাদেবই স্বপ্নে দেখা দিয়ে তাঁহাকে পাটের ব্যবসায়ে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই মহাদেবের কাছে মানত করিয়া হরিহর ঘোষালও লটারিতে টাকা পাইয়াছেন। এরকম ছোটোখাটো প্রমাণ ছাড়াও জীর্ণ মন্দিরবাসী মহাদেবের মহিমার আর একটি ভয়ানক প্রমাণ প্রতি বৎসর পাওয়াযায়। বৈশাখী পূর্ণিমার দিন মহাদেবকে কেন্দ্র করিয়া সনাতনপুরে প্রতি বৎসর প্রকাণ্ড উৎসব হয়। বহু নরনারী সেদিন শিবের মাথায় জল ঢালিয়া থাকেন,— শিব শিব হর হর বোম্ বোম্ ধ্বনিতে আকাশ বাতাস মুখরিত হয়। মুকুজ্জেরা এই উপলক্ষে যাত্রা থিয়েটার প্রভৃতি করাইয়া মহাদেবের স্বপ্ন-ঋণ শোধ করিবার প্রয়াস পান। চৌধুরীদের বাড়ি সেদিন আলোকমালায় সুসজ্জিত হয় এবং গ্রামের সকলে সেদিন সেখানে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হয়। আরও একটা ঘটনা সেদিন ঘটে, এইটাই মহাদেব-মাহাত্ম্যের জ্বলন্ত প্রমাণ— একজন লোক সেদিন পাগল হইয়া যায়। প্রতি বৎসরই এইরূপ হইয়া আসিতেছে। পাগল ভোলানাথ প্রতি বৎসর একজনকে তাঁহার নিজের দলে টানিয়া লন।

দুই

সে বছরও বৈশাখী-পূর্ণিমা-উৎসব সুসম্পন্ন হইল। মুকুজ্জেদের বাড়িতে অভিনীত কর্ণার্জুন নাটকের অভিনয়-চমৎকারিত্বে সকলেই পুলকিত। চৌধুরী-বাড়িতে যদিও পায়েসটা একটু ধরিয়া গিয়াছিল, তথাপি সকলে পরিতৃপ্ত সহকারেই আহার করিয়াছিলেন। মেলাটাও বেশ জাঁকজমক সহকারেই বসিয়াছিল। বিভিন্ন গ্রাম হইতে যাত্রীর সংখ্যা নিতান্ত কম আসে নাই। উৎসবের পরদিন এই সব লইয়া পালেদের ***চণ্ডীমণ্ডপে*** আলোচনা চলিতেছিল, এমন সময় যাদব আসিয়া বলিল, ওহে শুনেছ, এ বছর কেউ পাগল হয়নি!

সমস্ত আলোচনা থামিয়া গেল। বলে কি! এ যে অসম্ভব ব্যাপার। হরেন বলিল, কেন, ওই গেঁজেল বিশেটা?



চণ্ডীমণ্ডপ ঃ ঠাকুরদালান, যেখানে দুর্গা পূজা সহ অন্যান্য পূজা হয়। গ্রামের বিভিন্ন সভা, বৈঠক এখানেই হয়ে থাকে।

যাদব বলিল, দেখে এলাম, ঠিক আছে।

সকলেই আশা করিয়াছিল, বিশেই এবার মহাদেবের নাম রক্ষা করিবে। সেও ঠিক আছে।

প্রবীণ নীলমণি এতক্ষণ নীরবে আমাক খাইতেছিলেন। তিনি বলিলেন, এ হতে পারে না। ভাল করে খুঁজে দেখ, কেউ নিশ্চয় পাগল হয়েছে। চিরকাল ধরে হয়ে আসছে।

যাদব বলিল, এবার সকলের মাথা ঠিক আছে, কেউ বেঠিক হয়নি।

নীলমণি বলিলেন, হতে পারে না।

যাদব হাসিয়া বলিল, আমি বলছি, কেউ পাগল হয়নি এবার।

নীলমণি ধমকাইয়া উঠিলেন।

তুমি তো সেদিনকার ছোড়া হে, তোমার কথার আবার মূল্য কি? তোমার কথায় কি চিরকালের নিয়ম উল্টে যাব? নিশ্চয়ই হয়েছে কেউ না কেউ পাগল, এখনও জানা যায়নি।

যাদব স্মিতমুখে নীরব হইয়া রহিল।

তিনি

পরদিনও কোন পাগলের সন্ধান পাওয়া গেল না।

সনাতনপুরবাসীরা মনে মনে শঙ্কিত হইয়া পড়িলেন। নিশ্চয়ই কোন অমঙ্গল ঘটিবে। সত্যই এবছর কেহ পাগল হয় নাই। নানা লোকে নানা কথা বলিতে লাগিল। মহিলাগণ বলিলেন, এ রকমটা যে ঘটিবে তাহা তাঁহারা পূর্বেই অনুমান করিয়াছিলেন। বছরে মাত্র একদিন মহাদেবকে লইয়া ঘটা করিলে কি হইবে, বাকি তিনশো চৌষট্টি দিন তো শিবকে কেউ পোঁছেও না, শিবের মাথায় এক ফোঁটা জল পর্যন্ত পড়ে না। মহাদেব বলিয়াই এতদিন চুপ করিয়া ছিলেন। কিন্তু আর কত সহিবেন। মাতব্বর হালদার মহাশয় মত প্রকাশ করিলেন যে ইহা আর কিছুই নয়, কলির প্রতাপ। কলি নিজের প্রতাপ দেখাইবেন না? সনাতনপুরের মহাদেব বলিয়াই এতকাল নিজ প্রতাপ বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন, অন্য কোন মহাদেব হইলে কোন্ কালে তলাইয়া যাইতেন। উদাহরণস্বরূপ তিনি কয়েকটি মহাদেবের অধঃপতনের ইতিহাস বিবৃত করিলেন। ধনী মুকুজ্জেরা দায়ী করিলেন পুরোহিতকে— ওই ব্যাটাই কিছু গোলমাল করিয়াছে। পুরোহিত চৌধুরীদের কৃপাভিক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। নামহীন একটা বিপদের ছায়া সনাতনপুরের সকলকে আতঙ্কিত করিয়া রাখিল।

চাব

দমিলেন না কেবল দৃঢ়বিশ্বাসী নীলমণি।

তাঁহার বিশ্বাস কেহ না কেহ নিশ্চয় পাগল হইয়াছে, ইহারা তাহাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। সনাতনপুরের বুড়ো শিবের ***মাহাত্ম্য*** নিষ্প্রভ হইয়া যাইবে? হইতেই পারে না।

মাহাত্ম্য ঃ শব্দটির অর্থ— মহিমা, গৌরব, গুরুত্ব ইত্যাদি।

দারুণ দ্বিপ্রহর। বৈশাখের দ্বিপ্রহর।

প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত-চক্ষু স্ফীত-নাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে।

সনাতনপুরবাসিগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।

৭.৪.১ গল্পের সার সংক্ষেপ

সনাতনপুরের মহাদেব মন্দিরের দেবতা বড় জাগ্রত— একথা সে তল্লাটের মানুষমাত্র বিশ্বাসে সত্য বলে জানে। মন্দিরটি জরাজীর্ণ ও অবহেলিত হলেও ওই অঞ্চলের সমস্ত শুভকর্ম মহাদেবের কৃপাতেই ঘটে বলে জনতার বিশ্বাস। অঞ্চলের কারো মামলা নিস্পত্তি, রোগমুক্তি, লটারিপ্রাপ্তিকে মহাদেবের আশীর্বাদের প্রত্যক্ষ প্রমাণ হিসাবে চিহ্নিত করে বাসিন্দারা। 'জাগ্রত' মহাদেবের মন্দিরে প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় বড়সড় উৎসবের আয়োজন হয়। লোকবিশ্বাস মতে প্রতি বছর ওই দিন কেউ না কেউ পাগল হয়ে যান। পাগল ভোলানাথ প্রতি বছর একজনকে পাগল করে দলে টেনে নেন। গ্রামবাসীরা সাক্ষ্য দেন যে এমনটাই নিয়ম করে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। সনাতনপুর মন্দিরের মহাদেব জাগ্রত আছেন— এটাই তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ।

গল্পে সে বছর বৈশাখী পূর্ণিমা উৎসব সাড়ম্বরেই পালিত হয়। মেলা, যাত্রাগান, খাওয়াদাওয়া, ভক্তসমাগম অন্যান্য বছরের তুলনায় ভালো ভাবেই পার হয়। কিন্তু হঠাৎই একজন এসে খবর দেয় যে, সেই বৈশাখী পূর্ণিমায় কেউ পাগল হয়নি। গ্রামের লোক প্রথমে সে-সংবাদ বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে এমনটা অসম্ভব। ধীরে ধীরে তাঁরা সংবাদের সত্যতা মেনে নেন বটে কিন্তু বিভিন্ন সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। কেউ পুরোহিতকে দোষারোপ করেন তো কেউ দায়ি করেন বছরভর মহাদেবের প্রতি গ্রামবাসীর ঔদাসীন্যকে। একমাত্র গ্রামের বয়স্ক অধিবাসী নীলমণি কিছুতেই এই সংবাদের সত্যতা মেনে নিতে পারেন না। তিনি মনে করেন জাগ্রত মহাদেব থাকতে এমন ঘটনা কখনো সম্ভব নয়। গল্পের শেষে দেখা যায় প্রবীণ নীলমণি প্রচণ্ড রোদে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন। তাঁর চোখ লাল, নিঃশ্বাস সঘন। তিনি এবাড়ি সেবাড়ি পাগল খুঁজে চলেছেন। নীলমণি নিজেই পাগল হয়েছেন জেনে সনাতনপুরের বাসিন্দারা নিশ্চিন্ত হয়ে সিদ্ধান্ত নেন যে, মহাদেব এখনও জাগ্রত আছেন।

৭.৪.২ গল্প-বিশ্লেষণ

আপনারা নিশ্চই লক্ষ করেছেন, বনফুলের গল্প আয়তনে খুবই ছোট। আয়তনের দিকটিকে মাথায় রেখে কোনো কোনো আলোচক বনফুলের গল্পগুলিকে 'অনুগল্প' বিশেষণে চিহ্নিত করেছেন। ছোট পরিসরে টুকরো টুকরো ঘটনার বর্ণনায় বনফুল তাঁর গল্পগুলিকে নির্মাণ করেন। বর্ণনার টুকরো ঘটনাগুলিকে পাঠক তাঁর নিজের মতো করে জোড়া লাগিয়ে গল্পটি বের করে আনেন। গল্পের শেষ কথা লেখক এখানে কখনোই বলেন না। পাঠক তাঁর নিজের মতো করে গল্পটিকে সাজিয়ে নেন।

এই গল্পের নাম 'জাগ্রত দেবতা'। সত্যিই কি দেবতা জাগ্রত? অসুন গল্পের বর্ণনাগুলিকে জোড়া লাগিয়ে এর একটা মীমাংসাসূত্র বের করার চেষ্টা করা যাক। মহাদেব জাগ্রত— এটা গ্রামবাসীর বিশ্বাস। 'বিশ্বাস' এমন একটি ধারণা যাকে যুক্তিতর্কে প্রতিষ্ঠা করা যায় না। গ্রামবাসীর দৃষ্টিতে এই বিশ্বাসের পেছনে যে কয়টি প্রমাণের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে সেদিকে একবার নজর দেওয়া যাক। —এক, জনৈক বিপিন চৌধুরী মহাদেবের কাছে ***মানত*** করে মামলা জিতেছেন। দুই, পালেদের ছেলের রোগমুক্তি ঘটেছে। তিন, মুখুজ্জেদের বাড়বাড়ন্ত হয়েছে। চার, হরিহর ঘোষাল লটারি পেয়েছেন। —এবারে খেয়াল করুন মামলাটি আইনত বিপিনবাবুরই জেতার কথা কি না অথবা বিপিনবাবু মিথ্যা সাক্ষী জোগাড় করে মামলা জিতেছেন কি না, তা আমাদের অজানা। পালেদের ছেলের রোগের নিরাময় সম্ভাবনা ও চিকিৎসা প্রক্রিয়া সম্বন্ধে আমাদের কোনো ধারণা নেই। মুখুজ্জেদের বাড়বাড়ন্ত তাঁদের উদ্যমে কি না, সে প্রশ্ন অমীমাংসিত আর লটারিতে কেউ না কেউ পুরস্কার পাবেনই, ঘোষাল মহাদেবের কৃপাতেই পুরস্কৃত হয়েছে স্থির করে বলা যাচ্ছে কই ! —এই 'প্রমাণ'গুলিকে প্রমাণ হিসাবে মেনে নেওয়ার ক্ষেত্রে যে অনিশ্চয়তার কথা উল্লেখ করলাম, খেয়াল করে দেখুন গ্রামবাসীদের মনেও একই অনিশ্চয়তাগুলি কাজ করার কথা। করে না তার কারণ, বিশ্বাস প্রমাণ-নির্ভর নয়। বিশ্বাসী মন যেকোনো ঘটনাকেই তার বিশ্বাসের সপক্ষে প্রমাণ হিসাবে তুলে ধরতে চায়।

মানত ঃ বিপদ থেকে উদ্ধার পেতে দেবতার কৃপা লাভের জন্য অঙ্গীকার। মানসিক, কার্যসিদ্ধি হলে সেই অঙ্গীকার পালন করাটাই দস্তুর।

সনাতনপুরবাসীর কাছে মহাদেব জাগ্রত থাকার সবচেয়ে বড় প্রমাণ বৈশাখী পূর্ণিমাতে প্রতি বছর একজন পাগল হয়ে যাবার ঘটনা। প্রথমেই খট্‌কা লাগে ঈশ্বর তাঁর ভক্তের মস্তিষ্ক বিকার ঘটাবেন কেন! তাঁরতো ভক্তের মানসিক প্রশান্তি দান করারই কথা। গ্রামবাসীরা জাগ্রত দেবতার বিশ্বাস অক্ষুণ্ণ রাখতে যুক্তি খাড়া করেছেন যে, পাগল ভোলানাথ প্রতি বছর কাউকে না কাউকে পাগল করে দলে টানেন। লক্ষ করে দেখবেন যেকোনো ঈশ্বরিক শক্তির ধারণার পিছনে কোনো না কোনো ক্ষতি সাধনের ক্ষমতা লুকনো থাকে। পূজো না করলে ভগবান রুষ্ট হন, ভক্তের ক্ষতি সাধন করেন। যেখানে ভয় সেখানেই ভক্তি।

প্রতি বছর একজন পাগল হয়ে যাওয়া সত্যিই কি মহাদেবের জাগ্রত থাকার মস্তবড় প্রমাণ? যেকোনো রোগের মতো মানসিক ভারসাম্য হারানোও একটা রোগ। সনাতনপুরের শিব মন্দিরে আশপাশের অনেক গ্রাম থেকে ভক্ত সমাগম হয় বলে লেখক জানিয়েছেন। সনাতনপুর ও তার আশাপাশের গ্রাম মিলিয়ে যে বিরাট জনসংখ্যা, তার একজন মানসিক ভারসাম্যহীনতা হারানোর রোগে আক্রান্ত হওয়াটা কিন্তু মোটেই অস্বাভাবিক কোনো ঘটনা নয়। এই স্বাভাবিক ঘটনাটিকেই ***অলৌকিক***ত্বে প্রতিষ্ঠা করে মানুষ, তার বিশ্বাসের সপক্ষে যুক্তি খোঁজার তাগিদে।

প্রত্যাশার চাপ অত্যন্ত বেশি হয়ে গেলে আশাভঙ্গে মানুষ কখনো কখনো মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। ভেবে দেখুন জাগ্রত দেবতার বিশ্বাসে সীমাহীন আস্থাই কি নীলমণির মস্তিষ্ক বিকারের একমাত্র কারণ নয়? যে মুহূর্তে খবর পাওয়া গেল যে, কেউ পাগল হননি, অন্যান্য গ্রামবাসীরা কিন্তু ঘটনাটিকে মেনে নিয়ে তার কারণ হিসাবে বিভিন্ন যুক্তির সান্ত্বনা খুঁজে নিয়েছেন। ঘটনাটির সত্যতা মানতে পারেননি একমাত্র নীলমণি। কারণ জাগ্রত দেবতায় তাঁর বিশ্বাস ছিল অটল। যা কার্যত অন্ধবিশ্বাস। সেই বিশ্বাসভঙ্গের মানসিক চাপ সহ্য করতে না পেরেই তিনি পাগল হয়ে যান। বেদনার কৌতুক এটাই যে ঘটনার পরের বছর নীলমণির উদাহরণ মহাদেবের জাগ্রত থাকার জ্বলন্ত প্রমাণ হিসাবেই গৃহীত হবে। ঘটনার পূর্ববর্তী বছরগুলির উদাহরণগুলি লেখক আমাদের জানাননি। তাই তার বিশ্লেষণও সম্ভব নয়। কার্যত অন্ধবিশ্বাস কখনো তার বিশ্বস্ততার প্রমাণগুলিকে বিশ্লেষণ করে দেখতে চায়ও না।

অলৌকিক ঃ ইহলোকের ঘটনাবলির সঙ্গে সঙ্গতিহীন ঘটনা। যুক্তি-বুদ্ধিতে যে ঘটনাক্রমের ব্যাখ্যা দেওয়া যায় না।

এখন প্রশ্ন হল লেখক কি সত্যিই এই গল্পে দেবতাকে জাগ্রত দেখাতে চেয়েছেন? না কি 'জাগ্রত দেবতা' নামটি ব্যঙ্গাত্মক? —বনফুল রবীন্দ্রনাথের বিশেষণে 'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'। তিনি ভীষণভাবে যুক্তিপ্রবণ। বনফুলের পেশা ডাক্তারি। তিনি খুব ভালো করেই জানন যে পাগলামি আর দশটা রোগের মতো একটা রোগ। আবার আগের অধ্যায়ে আপনারা জেনেছেন যে সেকালে ব্যাঙ্গরচনার বাহুল্যে দৃষ্টি আকর্ষণকারী পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'-র অন্যতম লেখক ছিলেন বনফুল। সুতরাং বুঝতে অসুবিধা হয় না, এ-গল্পের নাম বনফুলের ব্যঙ্গপ্রবণতারই দৃষ্টান্ত। 'জাগ্রত দেবতা' নামকরণের মাধ্যমে বনফুল অন্ধবিশ্বাস নামক সামাজিক ব্যাধিটিকেই আঘাত করতে চেয়েছেন।

চরিত্রচিত্রন ও ঘটনা বর্ণনা এ-গল্পে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কলমের সামান্য আঁচড়ে তিনি চরিত্রগুলিকে চোখের সামনে এনে হজির করান। যত চরিত্র এইগল্পে এসেছে তাদের কেউই লেখকের অনাদর পায়নি। বিশেষ করে নীলমণি চরিত্রের বর্ণনায় লেখকের চরিত্রনির্মাণ পারদর্শিতা যেন সবচেয়ে উজ্জ্বল হয়ে ধরা দিয়েছে। অথচ চরিত্রটিকে ***চাক্ষুস*** করে তুলতে বনফুল পাঁচ-ছয়টি মাত্র বাক্য ব্যবহার করেছেন। বাংলা ছোটগল্পে এই পরিমিতিবোধে বনফুলের নাম অগ্রগণ্য। অসুন নীলমণির বর্ণনায় শেষ কয়েকটি লাইন আর একবার পাঠ করি— 'প্রখর রৌদ্রে চতুর্দিক পুড়িয়া যাইতেছে। ঘরে ঘরে কপাট জানালা বন্ধ। নীলমণি কেবল রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন। রক্ত-চক্ষু স্ফীত-নাসা। ঘরে ঘরে খোঁজ করিতেছেন, পাগলটা কোথায় গেল? তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করিতেই হইবে। সনাতনপুরবাসীগণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন। জাগ্রত মহাদেবের মহিমা জাগ্রতই আছে।'

চাক্ষুস ঃ প্রত্যক্ষ, চোখে দেখা যায় এমন।

আসুন জেনে নিই ঃ শব্দার্থ

আবালবৃদ্ধবণিতা ঃ শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্যন্ত সবাই।

জীর্ণঃ পুরনো, মলিন।

চণ্ডীমণ্ডপ ঃ ঠাকুরদালান, গ্রামের আলোচনা, সভা-সমিতির জায়গা।

গেঁজেল ঃ গাঁজাখোর।

মাতব্বর ঃ নেতা।

নিষ্প্রভ ঃ অনুজ্জ্বল।

দ্বিপ্রহর ঃ দুপুরবেলা।

অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন



প্রশ্ন নং ১৭ ঃ জাগ্রত দেবতা-র মন্দির কোন গ্রামে ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ১৮ ঃ জাগ্রত দেবতাকে কেন্দ্র করে বছরে কোন দিন উৎসবের আয়োজন হয়?

.....

প্রশ্ন নং ১৯ ঃ মুকুজ্জেদের বাড়িতে কোন যাত্রাপালা অভিনীত হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ২০ ঃ উৎসবের দিন কার বাড়িতে খাওয়া-দাওয়ার আয়োজন হয়েছিল?

.....

প্রশ্ন নং ২১ ঃ গল্পের বছর গ্রামবাসী আতঙ্কিত হয়ে পড়েন কেন?

.....

প্রশ্ন নং ২২ ঃ গল্পে শেষ পর্যন্ত কে পাগল হন?

.....

প্রশ্ন নং ২৩ ঃ ভরদুপুরে কে পাগল খুঁজতে বের হয়েছিলেন?

.....



৭.৫ অধ্যায়-সংক্ষেপ

- বনফুলের ছেলেবেলা ও শিক্ষাগ্রহণ পর্বগুলির বিষয়ে।

- বনফুলের ছদ্মনাম গ্রহণের তথ্য।
- কবিতা দিয়ে সাহিত্যচর্চা আরম্ভ করলেও ধীরে ধীরে গল্পকার তথা ঔপন্যাসিক হয়ে ওঠেন বনফুল।
- রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে বনফুলের পরিচয় পর্বের কথা।
- 'জাগ্রত দেবতা' গল্পটি অন্ধসংস্কারের বিপক্ষে একটি সাহিত্যিক প্রতিবাদ।
- গল্পটিতে আছে কুসংস্কারের প্রতি ব্যঙ্গ ও স্বল্প আঁচড়ে চরিত্র নির্মাণ।
- গল্পটির নামকরণই ব্যঞ্জনাময়।



৭.৬ অতিরিক্ত পঠন

১) গোস্বামী, পরিমল; *আমি যাঁদের দেখেছি।*

২) নন্দী, ঊর্মি ; *বনফুল ঃ জীবন মন ও সাহিত্য।*

৩) মুখোপাধ্যায়, নিশীথ; *বনফুলের জীবন ও সাহিত্য।*



৭.৭ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সত্যচরণ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তারি।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিকাশ।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃবটুকদা।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'চোখ গেল', 'প্রবাসী'।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ লীলাবতি।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পরিমল গোস্বামী।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ৩৪ টি।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ শান্তিনিকেতনে।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'কিছুক্ষণ'।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'শ্রীমধুসূদন'।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'জঙ্গম'।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'অন্তরীক্ষে'।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ 'বিজ্ঞানী মেজাজের সাহিত্যিক'।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৃহন্নলা বসাক, বলভদ্র কথক।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ জন্ম ঃ ১৮৯৯, মৃত্যু ঃ ১৯৭৯।

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সনাতনপুর।

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বৈশাখী পূর্ণিমা।

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কর্ণার্জুন।

২০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ চৌধুরীদের বাড়ি।

২১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ সেবছর কেউ পাগল হয়নি বলে।

২২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নীলমণি।

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ নীলমণি।



৭.৮ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

প্রশ্ন ১ ঃ কেন ও কোন পরিস্থিতিতে বলাইচাঁদ ছদ্মনাম গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেন— বনফুলের জীবনী অবলম্বনে সবিস্তারে লিখুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ২ ঃ বনফুলের গল্পলেখক হয়ে ওঠার নেপথ্য কথা সবিস্তারে লিখুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৩ ঃ বনফুলের জীবনকথা বিষয়ে একটি নিবন্ধ প্রস্তুত করুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৪ ঃ শৈশব ও কৈশোরের প্রাকৃতিক পরিমণ্ডল সাহিত্যিক বনফুলকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল আলোচনা করুন। (৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৫ ঃ বনফুলের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের পরিচয় প্রসঙ্গটি সংক্ষেপে লিখুন। (১৫০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৬ ঃ 'জাগ্রত দেবতা' গল্পের বিষয়বস্তু নিজের ভাষায় লিখুন। (অনধিক ৪০০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৭ ঃ 'জাগ্রত দেবতা' গল্প অবলম্বনে নীলমণি চরিত্রটি পরিস্ফুট করুন। (অনধিক ১৫০ শব্দের মধ্যে)।

প্রশ্ন ৮ ঃ 'জাগ্রত দেবতা' গল্পের নামকরণ সার্থক হয়েছে কি না আলোচনা করুন। (অনধিক ৪০০ শব্দের মধ্যে)।

*** ***** ***

অধ্যায় ৮ ঃ বনফুল— বিশ্বাস মশাই

অধ্যায় বিন্যাস

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

৮.২ পরিচিতি

৮.৩ বিশ্বাস মশাই — মূল পাঠ

৮.৩.১ গল্পের সার সংক্ষেপ

৮.৩.২ গল্প-বিশ্লেষণ

৮.৪ অধ্যায় সংক্ষেপ

৮.৫ অতিরিক্ত পঠন

৮.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

৮.৭ আদর্শ প্রশ্নাবলি

৮.১ জ্ঞাতব্য বিষয়

এই অধ্যায়টি পড়ে আপনি জানবেন —

- 'বিশ্বাস মশাই' গল্পে দেখবেন বিশ্বাস মশাই-এর আচরনে পরোপকারী ও মানব প্রেমিক রূপ
- ভারতবর্ষ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দেশ, এখানে অতিথিকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। সেই আদর্শ গল্প-কাহিনিতে জানবেন
- বনফুলের জীবনবোধের পরিচয় জানতে পারবেন।

৮.২ পরিচিতি

বাংলা ছোটগল্পে বনফুল একটি বিশেষ নাম। শিল্পী যেমন করে দুএকটি রেখার টানে একটি বৃহত্তর ব্যঞ্জনা ফুটিয়ে তোলেন, বনফুলও তেমনি তাঁর ছোটগল্পের অতি সংক্ষিপ্ত পরিসরে একটা বড়ো গল্পের আভাস দিয়ে পাঠককে চমকিত করে দেন। বনফুলের অধিকাংশ গল্পই দুই বা তিন পাতার গল্প। এখানে গল্পের চিরাচরিত চরিত্রাঙ্কন নেই, ঘটনার সংঘাত নেই, পাতার পর পাতা বর্ণনা নেই। আছে কেবল কয়েকটি আভাস এবং ইঙ্গিত। মনন ও কল্পনার সমাহার।

বনফুল আমৃত্যু বহু গল্প লিখেছেন। সংখ্যায় তা যেমন বিরাট (৫৭৮) তেমন এতগুলি গল্পের বিষয়বস্তু, চরিত্র চিত্রণ এবং নামকরণের কথা ভাবলেই তাঁর সৃজনীশক্তির বিপুলতা আমাদের কাছে বিস্ময়কর মনে হয়। নানা সংকলন গ্রন্থ সহ বনফুলের মোট গল্প গ্রন্থের সংখ্যা ৩৪। এর মধ্যে ১৯ টি হ'ল তাঁর মূল গল্পগ্রন্থ। বাকিগুলো নানা পুরোনো গল্প নিয়েই নতুন নতুন প্রকাশকের

নতুন নতুন গল্পগ্রন্থ। তাঁর সমগ্র গল্প প্রকাশ করার জন্য চারটি খণ্ড প্রকাশ করতে হয়েছে।

বনফুলের এই বিশাল গল্পভাণ্ডারকে সমালোচক নানাভাবে ভাগ করে আলোচনা করেন। যেমন— চরিত্র প্রধান গল্প, মনস্তত্ত্বমূলক গল্প, ডাক্তরি অভিজ্ঞতা প্রধান গল্প, ব্যঙ্গ ও হাস্যরস প্রধান গল্প ইত্যাদি। এই অধ্যায়ে আপনারা বনফুলের একটি গল্প পড়বেন। গল্পের নাম 'বিশ্বাস মশাই'। এটি একটি চরিত্র প্রধান গল্প।

৮.৩ বিশ্বাস মশাই — মূল পাঠ

হরিদ্বার ঃ হরিদ্বার একটি প্রাচীন শহর এবং হিন্দুদের পবিত্র তীর্থস্থান। ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের গঙ্গা নদীর তীরে হিমালয়ের পাদদেশে এর অবস্থান। হরিদ্বারের 'হর কী পাইরি' ঘাটের সন্ধ্যা-আরতি অতি মনোরম।

হুজুকে-বাঙালি ঃ 'হুজুকে-বাঙালি' এটি একটি জনশ্রুতি। হুজুক শব্দের আভিধানিক অর্থ সামান্য কোনও বিষয়ে ব্যাপক উত্তেজনা। বাঙালি মানুষের মন ভ্রমণ পিপাসু ও তারা উৎসব প্রেমি। সুযোগ পেলেই বাঙালিরা উৎসব অনুষ্ঠানে মেতে ওঠে। আর ছোট থেকে ছোট উৎসবও তারা স্বাড়ম্বরে ও উত্তেজনার সঙ্গে উদযাপন করতে ভালোবাসে। তাই বাঙালি জাতিকে হুজুকে-বাঙালি বলা হয়।

আমরা আগ্রার তাজমহল দেখব বলেই বেরিয়েছিলাম। কিন্তু আগ্রার বন্ধুবান্ধবেরা বললেন, "এতদূর যখন এসেছেন তখন ***হরিদ্বার***টাও দেখে যান।" আমাদের তত ইচ্ছে ছিল না। কারণ, প্রথমত, টাকা কমে গিয়েছিল; দ্বিতীয়ত, অত বড় পরিবার এবং লটবহর নিয়ে ঘোরা-ফেরা করবার আর উৎসাহ পাচ্ছিলাম না। আমাদের দলে যুবক-যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, বালক-বালিকা সবই ছিল, আর প্রত্যেকের বিবিধ রকম বায়নাক্কা। কেউ ঝাল পচন্দ করে, কেউ করে না ; কারও বাথরুম না হলে স্নানের সুবিধা হয় না; বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা ম্লেচ্ছাচার পচন্দ করেন না; ছোঁয়াছুঁয়ি হয়ে গেলে মেজাজ বিগড়ে যায় তাঁদের; দু-তিনটে ছেলে অসুখে পড়ে গেল। আর টাকা তো জলের মতো খরচ হচ্ছিল। তাই ভাবছিলাম, এখন ঘরের ছেলে ভালোয় ভালোয় ঘরে ফিরতে পারলেই বাঁচি। কিন্তু আগ্রার বন্ধুরা একেবারে নাছোড়। টাকা কমে গিয়েছে শুনে তাঁরা কিছু টাকা ধার দিতেও উদ্যত হলেন। তাঁদের বললাম, "হরিদ্বারে কাউকে তো চিনি না। এখানে আপনারা ছিলেন — কোনও অসুবিধা হয়নি।"

একজন বন্ধু বললেন, "হরিদ্বারেও হবে না, সেখানে বিশ্বাস মশাই আছেন —"

"বিশ্বাস মশাই কে?"

"গেলেই বুঝতে পারবেন।"

যদিও প্রত্যেকটি লোক অসুবিধা ভোগ করছিল, তবু হরিদ্বারের নামে উৎসাহিত হয়ে উঠিল সবাই। বিশেষ করে বৃদ্ধ-বৃদ্ধারা। শেষটা বন্ধুদের কাছ থেকে টাকা ধার করে যাওয়াই স্থির করলাম। ***হুজুকে-বাঙালী*** আর কাকে বলেঙ্গ

দুই

হরিদ্বারে পৌছলাম ভোরে। তখনও অন্ধকার ভালো করে কাটেনি। জানালা দিয়ে খুব আশাভরে মুখ বাড়ালাম, ভাবলাম কোনও অপরূপ দৃশ্য বুঝি চোখে পড়বে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুণ্ড টেনে নিতে হল। বৃষ্টি পড়ছে, কনকনে শীত। প্যাসেঞ্জার, কুলি ভিজে ভিজেই ছুটোছুটি করছে প্যাচপেচে প্লাটফর্মে। দমে গেলাম বেশ। মালপত্র আর সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে আমাকেও নামতে হবে এর মধ্যে। বিদেশে কুলিরাই বন্ধু। তাদেরই সাহায্যে নেমে পড়লাম অবশেষে। নেমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজতে লাগলাম। কোথায় যেতে হবে, কোথায় আশ্রয় মিলবে, কিচ্ছু জানা ছিল না। অবিলম্বে কয়েকটা পাণ্ডা এসে ঘিরে ধরল এবং কোথায় বাড়ি, পিতার নাম কী, পিতামহের নাম কী, কোনও পাণ্ডা ঠিক করা আছে কি না প্রভৃতি প্রশ্ন করে অস্থির করে তুলল সকলকে। কি করব

দিশহারা হয়ে ভাবছিলাম, এমন সময়ে বিশ্বাস মশাইয়ের কথা মনে পড়ল। একটা কুলিকেই জিজ্ঞেস করলাম, "আচ্ছা, বিশ্বাস মশাই কোথা থাকেন জান?"

"ওই তো বিশ্বাসবাবু। এ বিশ্বাসবাবু, এ বিশ্বাসবাবু, ইধর আইয়ে--"

কুলির ডাকে যিনি এসে দাঁড়ালেন, তাঁৰ চেহারা দেখে তো চক্ষুঃস্থির হয়ে গেল। এৰই ভরসায় আমরা এসেছিঙ্গ এ যে ভিখারী একটাঙ্গ পরনে আধময়লা জামাকাপড়, পায়ে শতচ্ছিন্ন ময়লা কেডস। মাথার চুলগুলো লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত, গোঁফ-দাড়িও আছে, তাও কেমন যেন খাপছাড়া গোছের, বেশ ঘনসন্নিবদ্ধ নয়, এখানে চারটি ওখানে চারটি ছড়ান-ছড়ান। রংটি কুচকুচে কালো। হাত দুটি জোড় করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। চোখ দুটি ছোট ছোট কিন্তু অপরূপ। যে বিনয়, ভদ্রতা এবং স্নিগ্ধতা ঝরে পড়ছিল সে-চোখের দৃষ্টি থেকে, তা আজকাল দুর্লভ। অথচ ভদ্রলোকের বেশবাস এমন কুৎসিত কেন। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম তাঁর দিকে।

"আমাকে ডাকছিলেন?"

নমস্কার করে বললাম, "আগ্রার মতিবাবু আপনার খোঁজ করতে বলে দিয়েছিলেন। আমরা এখানে নতুন এলাম তো, কিছুই জানি না, কাউকে চিনিও না--"

"তা বেশ চলুন, আমি যথাসাধ্য সাহায্য করব—"

তারপর কুলির দিকে ফিরে বললেন, "কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার ওখানে নিয়ে চল—"

বিশ্বাস মশাইয়ের পিছু-পিছু আমরা সার বেধেঁ চলতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে আমার ছোট ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। না নিলে ওর জন্যে আর একটা কুলি করতে হত। কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার আস্তানায় যখন পৌছলাম, তখন কুলিরা পয়সা চাইতে লাগল। সাধারণতঃ কুলিরা যা করে বিদেশী দেখে, খুব বেশি চাইতে লাগল। আমরা কাছে দশ টাকাৰ নোট ছিল, খুচরো পয়সা ছিল না, তাই বেশ একটু বিব্রত বোধ করতে লাগলাম।

বিশ্বাস মশাই বললেন, "নোটটা আমাকে দিন—"

অচেনা লোককে নোটটা দিতে একটু দ্বিধা হচ্ছিল প্রথমে, কিন্তু গত্যন্তর ছিল না বলে দিলাম। বিশ্বাস মশাই কুলিদের দিয়ে জিনিসগুলি যথাস্থানে রাখিয়ে বিছনাপত্র পাতিয়ে আমাদের খালি কুঁজো দুটি নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। কুলিরাও তাঁর পিছু-পিছু গেল। তারপর যা ঘটল তাতে অবাক হয়ে গেলাম। কুলিদের গোলমালে ব্যাপারটা এতক্ষণ বুঝতেই পারিনি। গঙ্গার কলকলধ্বনি শোনা গেল। নদী যে কলকলধ্বনি করে এ-কথা কেতাবেই পড়েছিলাম, কানে শুনিনি কখনও। কুম্ভকর্ণের বাড়িটা ঠিক গঙ্গার উপরই, তাড়াতাড়ি জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দেখলাম, যেন একটি তন্বী কিশোরী খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে চলেছে। গঙ্গার এমন রূপ আর কখনও দেখিনি। খুব কম চওড়া, নীলাভ জল, অত্যন্ত স্বচ্ছ, নীচের বালি পর্যন্ত দেখা যায়। আর বড় বড় মাছ নির্ভয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। অবাক হয়ে চেয়ে রইলাম। হঠাৎ হরিদ্বারের মহিমা যেন চোখে পড়ল, গম্ভীর বিরাট কিছু নয়, সজীব, সতেজ চিরনবীন।

"খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কোথ করবেন আপনারা—"

ঘাড় ফিরিয়ে দেখি বিশ্বাস মশাই ফিরে এসেছেন। নোটটি ভাঙিয়েছেন তিনি, কুলিপিছু দু-আনার বেশি দেনিন, কিছু টাকার খুচরো করে এনেছেন, এমন কি চার-আনার আধলা পর্যন্ত সংগ্রহ করেছেন। বললেন, "অনেক ভিকিরীকে দিতে হবে কি না।" পাই পয়সা হিসেব দিলেন, তারপর বললেন, " খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা কি করবেন বলুন—"

"কি ব্যবস্থা আছে এখানে?"

"দোকান থেকে কিনে খেতে পারেন। লুচি তরকারি পাওয়া যেতে পারে, ভাতও পাবেন একটা হোটেলে। কিন্তু ও-সব কি আপনারা খেতে পারবেন? দামও নেবে, তৃপ্তিও পাবেন না।"

আমার স্ত্রী বললেন, "এখানে রান্না করার ব্যবস্থা হয় না? আমাদের স্টোভ আছে—"

"হ্যাঁ মা, খুব হয়। আমি একটা তোলা উনুনেরও ব্যবস্থা করে দিতে পারি—"

"তাই হোক তাহলে। খিচুড়ি আর কিছু ভাজাভুজি করা যাক, বৃষ্টিও নেবেছে, জমবে ভালো।"

সকলে এই ব্যবস্থাতেই রাজী হয়ে গেল।

আমার শালী প্রশ্ন করলেন, "মুগ ডাল পাওয়া যাবে?"

"যেতে পারে। তবে এখানে অড়র বুটই বেশি চলে। আমি চেষ্টা করে দেখব।"

মুগের ডাল এখানে পাওয়া যায় না বলে বিশ্বাস মশাই কুণ্ঠিত হয়ে পড়লেন। এটা যেন তাঁরাই অপরাধ।

"মুগ না পাওয়া গেলে মশুরি আনবেন। খাঁড়ি মশুরি হলেই ভালো হয়—"

"চেষ্টা করব। খুবই চেষ্টা করব।"

"তরকারি কি পাওয়া যায় এখানে?"

"আলু, নেনুয়া, ঝিঙে। পেঁয়াজও পাওয়া যাবে।"

"পটল?"

আবার কুণ্ঠিত হলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, পটল এখানে পাওয়া যাবে না।"

"বেগুন?"

আরও কুণ্ঠিত হলেন।

"না, বেগুনও নয়।"

হাত কচলাতে লাগলেন ভদ্রলোক।

"লঙ্কা পাওয়া যাবে নিশ্চয়? " আমার স্ত্রী প্রশ্ন করলেন।

"তা যাবে, তা যাবে।"

উদ্ভাসিত হয়ে উঠল তাঁর মুখ।

ফোঁস করে উঠলেন আমার বোনটি।

"লঙ্কা পেয়ে আর কাজ নেই। বউদি খিচুড়িটি ঝালে পুড়িয়ে দেবে তাহলে।"

"তোকে আমি সাবু করে দেব, তাই খাস।"

কিন্তু-কিন্তু মুখ করে দাঁড়িয়ে রইলেন বিশ্বাস মশাই।

আমি তাঁকে গোটা পাঁচেক টাকা দিয়ে বললাম, "যা পান কিনে আনুন। আমি ততক্ষণ স্টোভ জ্বেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিই।"

দুটো ঘর নিয়েছিলাম আমরা। একটা ঘরে বাবা মা ছিলেন।

মা বেরিয়ে এসে বললেন, "আমার বাবা একটু গঙ্গাঁজল চাই।"

বিশ্বাস মশাই কখন যে কুঁজো দুটি ভরে এনেছিলেন টের পাইনি। বললেন, "দু কুঁজো জল আমি এনে রেখে দিয়েছি ও-ঘরে।"

"ও কুঁজো বাবা শতেক জাতে ছুঁয়েছে। একটু শুদ্ধ ভাবে যদি—"

"আচ্ছা আনব মা। নতুন কলসী কিনে ভরে আনি তাহলে—"

বিশ্বাস মশাই চলে গেলেন।

আমি স্টোভ জ্বেলে চায়ের জলটা চড়িয়ে দিলাম।

গিন্নী ছোট ছেলের কপালে হাত দিয়ে বললেন, "এর তো বেশ জ্বর হয়েছে দেখছি-"

মন্তব্য করলাম, "আগ্রাতেই তো ওর জ্বর হয়েছিল। লাফিয়ে তো চলে এলে।"

"আমি লাফিয়ে এলাম, না তুমি লাফিয়ে এলে? পরের ঘাড়ে দোষ চাপান তোমার কেমন একটা স্বভাব—"

দাম্পত্য কলহের উপক্রম হল।

ছোট ছেলেই থামিয়ে দিলে সেটা।

"না বাবা, আমার কিচ্ছু হয়নি। র‍্যাপার মুড়ে শুয়েছিলাম কিনা তাই কপালটা গরম হয়েছে—"

"খুব হয়েছে, শুয়ে থাক এখন"

মায়ের ধমক খেয়ে র‍্যাপার মুড়ি দিয়ে সে আবার শুয়ে পড়ল।

একটু পরেই বিশ্বাস মশাই বাজার থেকে ফিরলেন জিনিসপত্র নিয়ে। দেখালাম আপাদমস্তক ভিজে গিয়েছেন ভদ্রলোক। আমার শালীর দিকে চেয়ে মুচকি হেসে বললেন, "খাড়ি মুশুরিই পেয়েছি মা। বেশ ভালো ডাল।"

তাঁর পিছেন দেখলাম পাণ্ডাদের একটা ছোঁড়া নতুন কলসীতে করে গঙ্গাজলও নিয়ে এসেছে মায়ের জন্যে। বিশ্বাস মশাই আমার কাছে এসে কানে কানে বললেন, "আমিই নিয়ে আসতুম গঙ্গাজলটা, কিন্তু আমি তো ব্রাহ্মণ নই। কর্তা-মা যদি আপত্তি করেন, তাই ওকেই বললাম নিয়ে আসতে। গোটা চারেক পয়সা দিলেই চলবে।"

বিশ্বাস মশাই বাইরে দাঁড়িয়ে তাঁর সপসপে ভিজে কাপড়ের কোঁচাটা নিঙড়ে জল বার করতে লাগলেন। কামিজের সামনের দিকটাও নিঙড়ে ফেললেন।

চা হয়ে গিয়েছিল।

বললাম, "চা খান বিশ্বাস মশাই।"

"দেবেন? বেশ দিন--"

একটা গ্লাসে চা দিলাম। তিনি একধারে সসংকোচে বসে চা খেলেন।

গিন্নী বাজারের জিনিস দেখে বললেন, "গুঁড়ো হলুদ আর লঙ্কা এনেছেন, কিন্তু ও তো ধুলোয় ভরতি, ওতে খিচুড়ির রং তো ভালো হবে না—"

বিশ্বাস মশাই একটু অপ্রতিভ হয়ে পড়লেন।

"হ্যাঁ, সেকথা আমারও মনে হয়েছিল। আচ্ছা, দেখছি—"

পাণ্ডার সেই ছেলেটি তখনও দাঁড়িয়ে ছিল, বিশ্বাস মশাই তার কানে কানে কী বললেন, তারপর তাকে নিয়ে বেরিয়ে গেলেন। একটু পরেই দেখলাম তিনি ছোট একটি শিল-নোড়া, কিছু গোটা হলুদ আর শুকনো লঙ্কা নিয়ে এসেছেন।

আমার শালী বললেন, "ওরে বাবা, ওসব এখন বাটবে কে?"

"আমি বেটে দিচ্ছি, কতক্ষণ আর লাগবে—"

বিশ্বাস মশাই এক কোণে বসে বাটনা বাটতে লেগে গেলেন।

বাটনা বেটে তোলা উনুনটা নিয়ে এলেন তিনি। বাজারে যাওয়ার সময়েই সেটাতে আঁচ দিয়ে গিয়েছিলেন। গিন্নী খুশি হলেন খুব। বেশ গনগনে আঁচ উঠেছে।

শালী বললেন, "আমি আলু-ছেঁচকি করব। ঊষা, তুই ভাই আলুগুলো কুটে ফেল—। ও হরি বঁটিই যে নেই—"

"এনে দিচ্ছি—"

বিশ্বাস মশাই পাণ্ডাদের কাছ থেকে বঁটি যোগাড় করে আনলেন।

আলু কোটা হলে আবিষ্কৃত হল ছেঁচকি হওয়ার পথে আর একটি অন্তরায় বিদ্যমান। পাঁচ-ফোড়ন নেই। বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন।

তারপর স্নান করার পালা। গঙ্গার স্রোত এত বেশি যে, সেখানে নেবে দাঁড়ান পর্যন্ত যায় না। একটা শিকল আছে সেইটা ধরে কোনওরকমে একটা কি দুটো ডুব দেওয়া যায়। বিশ্বাস মশাই সবাইকে একে একে নিয়ে গিয়ে স্নান করিয়ে আনলেন। তারপর দল-বেধেঁ সবাইকে নিয়ে মন্দির, হর কি পৈরি প্রভৃতি দ্রষ্টব্য স্থানগুলি দেখিয়া আনলেন।

এসব সেরে বেশ ক্ষিধে পেয়ে গেল সকলের। তখনও কিন্তু রান্না চড়েনি। ঠিক হল কিছু গরম লুচি-তরকারি খেয়ে নেওয়া যাক জলখাবার হিসেবে। বিশ্বাস মশাই আবার গেলেন সে-সব ভাজিয়ে আনতে। তাঁকে পই-পই করে বলে দেওয়া হল, তিনি যেন নিজের সামনে ভাজিয়ে আনেন সব।

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তা আনব বই কি। নিজের সামনে ভাজিয়া আনব।"

বৃষ্টির বেগটা কমেছিল কিন্তু টিপ-টিপ করে করে পড়ছিল তবু। বিশ্বাস মশাই বেশ ভিজেই ফিরলেন।

বললাম, "বিশ্বাস মশাই, আপনি কাপড়টা জামাটা ছেড়ে ফেলুন না।"

বিশ্বাস মশাই নির্বিকার। খাবারের ঝুড়িটা খুলতে লাগলেন। বললেন, "খাঁটি ঘিয়ে ভাজিয়া এনেছি। আচারও বেশি করে এনেছি একটু--"

"এনেছেন বেশ করেছেন। কাপড়-জামাটা ছাড়ুন—"

বিশ্বাস মশাই হেসে বললেন, "ও একেবারে রাত্রে শোবার সময় ছাড়ব। শুকনো জামা-কাপড় পরলে আবার এখুনি তো ভিজে যাবে।"

বুঝলাম, এ বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা আছে। কারণ পরমুহূর্তেই বাবা বললেন, তাঁর নস্যি ফুরিয়ে গিয়েছে, এখানো পাওয়া সম্ভব কি?

তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে উঠলেন বিশ্বাস মশাই।

"হ্যাঁ, সম্ভব বই কি। র-মাদ্রাজী, পরিমল দু-রকমই পাওয়া যাবে। কোন্‌টা আনব বলুন"

বাবা র-মাদ্রাজী আনতে বললেন। র-মাদ্রাজী নস্যি এনে বিশ্বাস মশাই পা-টি মুড়ে যেই বসেছেন, অমনি আমার গিন্নী বললেন, "ছায়া, চিরুনিটা যে তোর হাতে দিলুম আগ্রা হোটেলে"

ছায়া আমার শালী। সে ভ্রূকুঞ্চিত করে বললে, "আমার হাতে কখন দিলে আবার। দিয়ে থাকলে ওই অ্যাটাচিতেই রেখেছি—"

"কই এতে তো নেইঙ্গ"

বাক্স, সুটকেস, তোরঙ্গ সব খোঁজ হল। চিরুনি নেই।

সুতরাং বিশ্বাস মশাই আবার ছুটলেন চিরুনি কিনতে, স্বেচ্ছায় এবং সানন্দে ছুটলেন। আমি তাঁকে কয়েকটা কুইনিন ট্যাবলেট আনতে দিলাম আমার ছোট ছেলেটার জ্বর যদি বেড়ে যায়, বিপদে পড়ে যাব এই বিদেশে। সমস্ত এনে দিলেন বিশ্বাস মশাই।

খিচুড়ি আর আলুর ছেঁচকি তৈরি হয়ে গিয়েছিল। বিশ্বাস মশাইকেও আমাদের সঙ্গে খেতে বলেছিলাম। খাওয়ার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে বিশ্বাস মশাই বললেন, "একটু অপেক্ষা করন। ভালো ঘি আছে আমার একটু, নিয়ে আসি—।" দৌড়ে চলে গেলেন এবং ভালো গাওয়া ঘি নিয়ে এলেন একটা শিশি করে। বললেন, কলকাতা থেকে এক ভদ্রলোক এসেছিলেন, তিনি দিয়ে গিয়েছেন এটা তাঁকে। বেশ তৃপ্তি সহকারে খাওয়া গেল।

খেয়েদেয়ে শুয়ে পড়লাম আমরা সবাই। বিশ্বাস মশাই বসে রইলেন একধারে দেওয়ালে ঠেস দিয়ে।

"আপনিও যান না, একটু বিশ্রাম করে নিন।"

বিশ্বাস মশাই সসঙ্কোচে বললেন, "আপনাদের যদি কোনও দরকার হয়—"

"না, আর কিছু দরকার হবে না। আপনি একটু বিশ্রাম করে নিন গিয়ে। বিকেলে এসে আমাদের সঙ্গে চা খাবেন।"

চলে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

বিকেলে এলেন একটি লোক সঙ্গে করে। বললেন, "আপনারা কি ***হৃষীকেশ, লছমনঝোলা*** যাবেন। যদি যান, তাহলে বাসে করেই যাওয়া ভালো। ইনি আমার চেনা বাসওলা।



হৃষীকেশ ঃ ভারতবর্ষের উত্তরাখণ্ড রাজ্যের একটি শহর হৃষীকেশ। হিমালয়ের পাদদেশে পবিত্র গঙ্গা নদীর তীরে এর অবস্থান। হৃষীকেশ শহরটি যোগ অধ্যয়ন এবং ধ্যানের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত। ***লছমনঝোলা ঃ*** গঙ্গা নদীর উপর নির্মিত একটি লোহার সেতু। এই সেতুটি হৃষীকেশ শহর থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। এই সেতুটি তেহরি গড়য়াল জেলার তপোবন এবং পউরি গড়য়াল জেলার জংক নামের দুটি স্থানকে সংযোগ করেছে। জনশ্রুতি রয়েছে লক্ষ্মণ রসির সাহায্যে এখান দিয়ে গঙ্গা নদী পার করেছিলেন। সেই জন্যেই ১৯২৯ সালে এখানে সেতু নির্মাণ হলে তার নাম দেওয়া হয় লছমনঝোলা।

একটা ছোট বাস যদি রিজার্ভ করে নেন, ইনি সস্তায় করে দেবেন—"

বললাম, "যেতে তো খুবই লোভ হয়। কিন্তু আমাদের ব্যাপার তো দেখছেন, এখানে আপনি ছিলেন তাই সামলে দিলেন, কিন্তু সেখানে—"

"যদি বলেন সেখানেও আমি যাব।"

খবরটি পাওয়ামাত্র চনমন করে উঠলো সবাই।

বাবা বললেন, "এতদূর এসে যদি না দেখে ফিরে যাই তাবালে আমাদের আর দেখা হবে না। তোমরা হয়তো আবার আসতে পার কিন্তু আমরা আর পারব না।"

এ-যুক্তি অকাট্য। একটা কুইনিনের বড়ি খেয়ে ছেলেটার জ্বরও কমে গিয়েছিল। সুতরাং যাওয়াই স্থির হল।

হৃষীকেশ- লছমনঝোলায় বর্ণনা করে সময় নষ্ট করব না, কারণ তা বর্ণনা করা যাবে না। হৃষীকেশ- লছমনঝোলায় বিশ্বাস মশাই যা করেছিলেন তা-ও প্রায় অবর্ণনীয়। আমি ক্লান্ত হয়ে শুয়ে পড়েছিলাম বলে আমার পা পর্যন্ত টিপে দিয়েছিলেন তিনি। হৃষীকেশরে সরাইখানায় বিশ্বাস মশাইকে একটু নির্জনে পেয়েছিলাম রাত্রিবেলা।

জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনার দেশ কোথা বিশ্বাস মশাই। বাংলা দেশে নিশ্চয়?"

"হ্যাঁ, বাংলা দেশে বই কি। তবে সে-দেশ ছেলেবেলায় ছেড়ে এসেছি।"

"কোথা বাড়ি ছিল আপনার?"

"তা আর না-ই শুনলেন। আমি সামান্য লোক—"

কাঁচুমাচু হয়ে থেমে গেলেন বিশ্বাস মশাই।

"না, না, বলুন শুনি।"

"আমার পরিচয় দেবার মতো নয়। আমি বংশের মুখ উজ্জ্বল করতে পারিনি, লেখাপড়া পর্যন্ত শিখিনি, ছেলেবেলায় বাড়ি থেকে পালিয়ে এসেছিলাম।"

সসঙ্কোচে থেমে গেলেন।

"বাংলা দেশের কথা মনে আছে আপনার?"

"খুব বেশি নেই। তবে একটি ছবি মনে আছে। ছোট একটি পুকুর, পুকুরের পাড়ে তালগাছ নারকেল গাছ। পুকুরের জল কুচকুচে কালো, সবুজ পানায় ঢাকা, ঘাটে একটি বউ কলসী ভাসিয়ে চান কচ্ছে, টুকটুকে লাল গামছা তার হাতে। হৃষীকেশ হরিদ্বারের গঙ্গার চেয়েও ও-ছবি আমার বেশি ভালো লাগে—"

"আপনি তো কবি-লোক দেখছি—"

কুণ্ঠিত হাসি হেসে বিশ্বাস মশাই বললেন, "আমি সামান্য লোক। তবে আমার দাদা একজন নামজাদা লোক ছিলেন, তাঁর কথা বলতেও লজ্জা করে আমার। আমি তাঁর ভাই হওয়ার উপযুক্ত নই।"

"কে আপনার দাদা বলুন তো—"

"কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস। আমি দাদার নামের মর্যাদা রাখতে পারিনি।"

স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

"আপনি কি করেন এখানে-- কোথা থাকেন"

"এই যাত্রীদের বিশেষ করে বাঙালী যাত্রীদের, সেবা করি। এ ছাড়া আর কি করবার যোগ্যতা আছে বলুন— বাসা বলে তো আমার কিছু নেই। ট্রেনগুলো অ্যাটেণ্ড করি, যদি কোনও যাত্রী আসে। প্ল্যাটফর্মেই থাকি অধিকাংশ সময়। আর তা না হলে ওই কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার বাড়ির বারান্দায়। যাত্রীদের সেবা করাই কাজ তো—"

পাশের ঘরে আমার ছোট ছেলেটার গলার আওয়াজ পেয়ে উঠে পড়লেন বিশ্বাস মশাই।

"খোকন উঠেছে, ওর জন্যে দুধ যোগাড় করেছি একটু, গরম করে খাইয়ে আসি--

তাড়াতাড়ি উঠে চলে গেলানঙ্গ

ফেরবার সময় হরিদ্বারে বিশ্বাস মশাই এলেন আমাদের ট্রেনে তুলে দেবার জন্য। অনেক রাত হয়েছিল। নিজের হাতে তিনি আমাদের বিছনাপত্র পেতে দিলেন, জিনিসগুলি গুছিয়ে দিলেন। কুঁজোতে জল ভরে দিলেন, রাত্রের খাবার আলাদা করে বেঁধে দিলেন, তারপর প্লাটফর্মে নেমে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্যদিকে চেয়ে। মনে হল, তিনি যেন অতি প্রিয় পরিজনদের বিদায় দিতে এসেছেন।

ট্রেন ছাড়বার ঘণ্টা পড়ল, গার্ড সাহেব বাঁশি বাজালেন।

হঠাৎ আমার কি মনে হল হঠাৎ মুখ বাড়িয়ে ডাকলাম—

"বিশ্বাস মশাই, শুনুন—"

বিশ্বাস মশাই এগিয়ে এলেন।

"এইটে রেখে দিন, সামান্য কিছু—"

একখানা দশ টাকার নোট বার করে তাঁর হাতে দিলাম।

"অ্যাঁ, এ কি, আপনি আমাকে টাকা দিলেন, টাকা দিলেনঙ্গ"

ট্রেন তখন চলতে শুরু করেছে।

দেখলাম, বিশ্বাস মশাই নোটটি হাতে করে অসহায়ভাবে চেয়ে রয়েছেন আমাদের গাড়ির দিকে। তাঁর মুখ বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে।

৮.৩.১ গল্পের সার সংক্ষেপ

গল্প কথক আগ্রার তাজমহল দেখার জন্য সপরিবারে আগ্রায় আসেন। আগ্রার বন্ধুবান্ধবেরা পরামর্শ দেন, একই সঙ্গে হরিদ্বারও ঘুরে যেতে। এই প্রস্তাবে প্রথম অবস্থায় গল্প কথকের অমত ছিল। কারণ তাঁর কাছে টাকা কমে গেছে এবং অত বড় পরিবার নিয়ে ঘুরতে তিনি উৎসাহ পাচ্ছিলেন না। কিন্তু পরিবারের সকলের উৎসাহ দেখে তিনি স্থির করেন হরিদ্বার যাবেন। আগ্রার বন্ধুরা বলেছিলেন হরিদ্বার গিয়ে বিশ্বাস মশাই এর সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনিই সব ব্যবস্থা করে দেবেন।

পরেরদিন ভোরে গল্প কথক সপরিবারে হরিদ্বারে পৌঁছোন। কুলির সাহায্য নিয়ে হরিদ্বারের প্ল্যাটফর্মে নামলেন। সেখানে কুলির কাছে বিশ্বাস মশাই এর কথা জিজ্ঞেস করাতে, তারা তাঁকে ডেকে দেয়। প্রথম অবস্থায় বিশ্বাস মশাইকে দেখে গল্পের বক্তার চক্ষুঃ স্থির হয়ে যায়। কারণ তাঁর মনে হয়েছিল যার ভরসায় তিনি হরিদ্বারে এসেছেন, তিনি যে 'ভিক্ষারী একটা'। পরনে সাধারণ জামা-কাপড়, পায়ে শতছিন্ন ময়লা কেডস। মাথার চুলগুলি লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত, গোঁফ-দাড়িও আছে, তাও কেমন যেন মাপছাড়া, গায়ের রং কুচকুচে কালো। গল্প কথক বিশ্বাস মশাইকে বললেন তাঁরা এখানে নতুন এসেছেন, কিছুই জানেন না, কাউকে চেনেনও না। তাই আগ্রার মতিবাবু বলছিলেন এখানে আপনার খোঁজ করতে। গল্পের বক্তার কথা শুনে বিশ্বাস মশাই প্রতিশ্রুতি দেন, তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করবেন।

তারপর বিশ্বাস মশাই গল্পের বক্তা ও তাঁর পরিবারের সকলকে গঙ্গা তীরবতী কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার যাত্রী নিবাসে নিয়ে যান। গল্পের বক্তাকে নতুন মানুষ দেখে কুলিরা বেশি ভাড়া চাইল। কিন্তু কুলিরা যাতে গল্পের বক্তার কাছ থেকে বেশি ভাড়া নিতে না পাড়ে, তারজন্য বিশ্বাস মশাই তাঁর কাছ থেকে দশ টাকা চেয়ে নিয়েছেন এবং কুলিপিছু দু-আনার বেশি দেননি। বাকি টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন গল্পের বক্তাকে। যাত্রী নিবাসে তাঁদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তার জন্যে বিশ্বাস মশাই নিজে বিছানাপত্র পেতে দিলেন এবং নিজ হাতেই সবার সব রকম আবদার পূরণ করেছেন। সবার জন্য খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন এমনকী উনুন, চাল, ডাল, আলু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পিতার নসসি পর্যন্ত কিনে এনে দিয়েছেন। আবার গল্পের বক্তার মার গঙ্গাজল লাগবে দেখে পাণ্ডাকে সঙ্গে নিয়ে গঙ্গাজল আনিয়েছেন। এতকিছু করতে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজে গেলেও এব্যাপারে তিনি কোনও আক্ষেপ করেননি।

এরপর সকলের স্নান করার পালা। হরিদ্বারে গঙ্গার স্রোত এত বেশি যে, সেখানে দাঁড়ানো পর্যন্ত যায় না। বিশ্বাস মশাই এক এক করে শিকল ধরে সবাইকে স্নান করান। তারপর দল বেঁধে সবাইকে নিয়ে মন্দির, হর কি পৈরি প্রভৃতি স্থান গুলি দেখিয়ে আনেন। মন্দির ঘুরে এসে সকলের খুব খিদে পেয়েছিল। কিন্তু রান্না তখনও শুরু হয়নি। তাই বিশ্বাস মশাই সবার জন্যে লুচি-তরকারি খাবার আয়োজন করেন। এরপর খিচুড়ি আর আলুর ছেঁচকি রান্নার সময় বিশ্বাস মশাই তাঁদের তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছেন। রান্নার সব্জি কেঁটে দিয়েছেন। মশলা বেটে দিয়েছেন। বার বার বাজারে গিয়ে পাঁচফোরণ, গোটা হলুদ, শুক্ল লঙ্কা এনেদেন। খিচুড়ি খেতে স্বাদ হবে বলে নিজের ঘর থেকে ঘি এনে দিয়েছেন। তারপর দুপুরের খাবার খেয়ে সবাই বিশ্রাম নেন। বিশ্বাস মশাই তখন নিজের ঘরে চলে যান।

বিকেলে বিশ্বাস মশাই পুনরায় আসেন এবং সকলের মত নিয়ে হৃষীকেশ, লছমনাঝোলা যাওয়ার আয়োজন করলেন। হৃষীকেশে বিশ্বাস মশাইকে একা পেয়ে

গল্পের বক্তা তাঁর পরিচয় জানতে চান। তাঁদের কথোপকথন থেকে জানা যায় বিশ্বাস মশাই এর বাড়ি বাংলাদেশে। তিনি কর্নেল সুরেশ বিশ্বাসের ভাই। ছোটবেলাতেই তিনি বাড়ি থেকে পালিয়েছিলেন। এখন তিনি হরিদ্বারে থাকেন এবং বাঙালি যাত্রীদের, সেবা করেন।

হরিদ্বারে থেকে গল্পের বক্তাদের ফেরবার সময় বিশ্বাস মশাই এসেছিলেন তাঁদের ট্রেনে তুলে দেবার জন্য। তখন অনেক রাত হয়েছিল। তিনি নিজের হাতে সকলের জন্য বিছানপত্র পেতে দিলেন, জিনসপত্রগুলি গুছিয়ে দিলেন। কুঁজোতে জল ভরে দিলেন, রাত্রির খাবার আলদা করে বেঁধে দিলেন। তারপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন অন্যদিকে চেয়ে। গল্পের বক্তা তাঁকে ডেকে একটি দশ টাকার নোট বের করে তাঁর হাতে দিলেন। টাকাটি হাতে নিয়ে বিশ্বাস মশাই অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলেন গাড়ির দিকে। তাঁর মুখ তখন বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে।

৮.৩.২ গল্প বিশ্লেষণ

বাংলা ছোটগল্পের আসরে বনফুল ছদ্মনামে খ্যাত বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় একটি স্মরণীয় নাম। তাঁর হাতে বাংলা ছোটগল্প গুলি রূপে রসে স্বাদে বর্ণে অপরূপ হয়ে উঠেছে। সহজ সরল ভাষায় এবং সাবলীল ভঙ্গিমায় বক্তব্য উপস্থাপনা তাঁর গল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মানুষের চরিত্রের বিভিন্ন দিক গুলিকে তিনি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন তাঁর গল্পে। মানুষের আচরণ ও তাদের ধ্যান ধারণার স্বরূপ উদঘাটনে বনফুল অসামান্য দক্ষতা দেখিয়েছেন। সবচেয়ে বড় কথা তাঁর গল্পে চরিত্রগুলি কেউই অপরিচিত কাল্পনিক নয়। এরা সমাজের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উঠে আসা বিভিন্ন শ্রেণির রক্ত-মাংসের মানুষ। বনফুলের গল্পের আর একটি বৈশিষ্ট্য হল তাঁর অনেক গল্পে তিনি নিজেকে সুন্দরভাবে জড়িয়ে রেখেছেন, অর্থাৎ 'আমি' জবানিতে বৈঠকি মেজাজে গল্পগুলি শুনিয়েছেন। আর এ ক্ষেত্রে কখনও বা তিনি ডাক্তার, ব্যবসাদার, আবার কখনওবা পর্যটক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করেছেন।

'বিশ্বাস মশাই' বনফুলের এক ভিন্ন স্বাদের চরিত্র প্রধান গল্প। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিশ্বাস মশাইকে লেখক অসামান্য রুপে চিত্রিত করেছেন। ভারতবর্ষ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দেশ। এখানে অতিথিকে দেবতার সঙ্গে তুলনা করা হয়। আর এই আদর্শকে অতি নিষ্ঠা সহকারে ধারণ করেছেন বিশ্বাস মশাই।

বর্তমান যুগে মানুষ অর্থ লিপ্সা ও বিষয় বাসনায় জড়িয়ে নিজকে আত্মসুখে নিমগ্ন রাখতে আগ্রহী। তারা আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর এবং সংকীর্ণ জগৎ নিয়ে ব্যস্ত। কিন্তু বিশ্বাস মশাই এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। তিনি যেন প্রাচীন ভারতের পরোপকারী ও মানব প্রেমিক মানুষের প্রতিনিধি। তিনি বিশ্বাস করেন 'মানুষ মানুষের জন্য'।

বিশ্বাস মশাইর সঙ্গে গল্পের বক্তার সাক্ষাৎ হয় হরিদ্বারে। আগ্রা ভ্রমণকালে বন্ধুদের পরামর্শ নিয়েই তিনি বৃদ্ধ বাবা-মা, স্ত্রী-পুত্রসহ সপরিবারে বেড়াতে আসেন এবং সেখানেই বিশ্বাস মশাইর সঙ্গে তাঁর প্রথম দেখা হয়। লোকটির সম্পূর্ণ নাম হয়ত অনেকের কাছে অজ্ঞাত। কিন্তু বিশ্বাস মশাই নামটি সবার সুপুরিচিত। তিনি দেখতে অত্যন্ত সাধারণ; প্রথম দেখায় বক্তার মনে হয়েছিল 'ভিখারী একটি'। পরণে সাধারণ জামা-কাপড়, পায়ে শতছিন্ন ময়লা কেডস। মাথার চুলগুলি লম্বা লম্বা এবং অবিন্যস্ত গোঁফ-দাড়িও আছে; তাও কেমন যেন মাপছাড়া। গায়ের রং কুচকুচে কালো। সব সময়ে বিনীত ভঙ্গি। কিন্তু ছন্নছাড়া দীনতার প্রতিমূর্তি লোকটি অন্তরের ঐশ্বর্যে সমৃদ্ধ। এর প্রমাণ তাঁর অপরূপ চোখ দুটি। বিনয়, ভদ্রতা, মহত্ব ও স্নিগ্ধতা সে চোখ দুটি থেকে ঝরে পড়ছিল। পরম করুনাময় নির্লোভ-নিরঅহংকারী বিশ্বাস মশাইর জীবনের পরম ব্রত হচ্ছে অপরিচিত তীর্থযাত্রীদের সেবা করা।

গল্পের কাহিনিতে রয়েছে যে গল্পের বক্তা হরিদ্বারে বৃদ্ধ বাবা-মা-স্ত্রী-পুত্র সবাইকে নিয়ে এসে প্রথমে দিশেহারা হয়ে পড়েন এবং আগ্রার বন্ধুদের উপদেশ মতে বিশ্বাস মশাই এর খোঁজ করেন। তবে বিশ্বাস মশাই এর সন্ধানে তাঁকে বেশি কষ্ট করতে হয়নি। কারণ বিশ্বাস মশাই তাঁর সহজ সরল উপকারী স্বভাব গুনে এতই জনপ্রিয় যে তাঁকে এক ডাকে সবাই চিনে। তাঁর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর বক্তা সব ব্যাপারেই নিশ্চিন্ত হয়েছেন। প্রথমেই বিশ্বাস মশাই তাঁদের গঙ্গা তীরবর্তী কুম্ভকর্ণ পাণ্ডার যাত্রী নিবাসে নিয়ে গেছেন। এরপর কুলিরা বেশি ভাড়া চাইলে তিনি লেখকের কাদ থেকে আপনজনের মতো দশটাকার নোট চেয়ে নিয়েছিলেন এবং কুলিপিছু দু-আনার বেশি দেননি। বাকী টাকা ফিরিয়ে দিয়েছেন বক্তাকে এরপর তাঁদের বিছানাপত্র যাত্রী নিবাসে পেতে দিলেন এবং নিজ হাতেই সবার আবদার পূরণ করেছেন।

এই পরোপকারী নির্লোভ পরিশ্রমী ব্যক্তির কোনও লিপ্সা নেই, কামনা নেই, তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য জনসেবা করা। তাই আমরা দেখেছি যে, বিশ্বাস মশাই সবার জন্য খাওয়ার বন্দোবস্ত করেছেন। উনুন, চাল, ডাল, আলু থেকে শুরু করে বৃদ্ধ পিতার নস্‌সি পর্যন্ত কিনে এনে দিয়েছেন। কখনও বা তাঁদের চাহিদা অনুসারে বিরল কিন্তু সামান্য জিনিস তাঁদের এনে না দিতে পারার জন্য মনে মনে অপরাধ বোধে ভুগেছেন। তাই বিশ্বাস মশাইর মতো মানুষ চিরকাল 'মাটির মানুষ' বিশেষণে ভূষিত হন। তিনি যেন দাতাকর্ণ, দাতা শিবি এঁদের উত্তরসূরী। তাঁর জীবন ধারা গীতার কর্মবাদ দ্বারা পরিপুষ্ট। তাঁর কাছে 'কর্মই ধর্ম'; আর সেই কর্ম হল নিষ্কাম কর্ম।

গল্পকথকের মা-র গঙ্গাজল লগবে দেখে বিশ্বাস মশাই তাঁদের জন্য গঙ্গাজল আনতে গিয়ে ভিজে গেলেও এ ব্যাপারে তাঁর কোনও আক্ষেপ নেই। তিনি তাঁদের তোলা উনুনে আঁচ দিয়েছেন। রান্নার সব্জি কেঁটে দিয়েছেন। মশলা বেটে দিয়েছেন। বার বার বাজার গিয়ে পাঁচফোরণ, গোটা হলুদ, শুরু লঙ্কা এনেছেন। খিচুড়ি খেতে স্বাদ

হবে বলে নিজের আশ্রয় থেকে ঘি এনে দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সবাইকে এক এক করে শিকল ধরে গঙ্গা স্নান করিয়ে এনেছেন। তাঁদের জন্য হরিদ্বারের বিখ্যাত গাওয়া ঘিয়ে ভাজা লুচি তরকারি, সামনে দাঁড়িয়ে থেকে ভাজিয়ে এনেছেন। এজন্য বৃষ্টিতে ভিজতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু বিশ্বাস মশাই তবুও নির্বিকার।

বিশ্বাস মশাই একজন অতি সাধারণ দরিদ্রব্যক্তি কিন্তু তাঁর পরোপকারী মনোভাব, অতিথি সেবা ও নির্লোভতা তাঁকে অসাধারণ করে তুলেছে। তিনি বড় বংশের ছেলে। তাঁর দাদা সুবিখ্যাত কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস। কিন্তু তিনি আত্মপ্রচারে বিমুখ। তীর্থ যাত্রীদের সেবা করা তাঁর জীবনের একমাত্র ব্রত। তাই ছেলেবেলাতেই তিনি বাংলাদেশ থেকে পালিয়ে হরিদ্বারে এসেছেন। কিন্তু বাংলা এবং বাঙালিকে তিনি ভুলতে পারেননি। ভুলেননি ভারতের কৃষ্টি, সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ভারতবাসীর সেবাব্রত।

এইজন্য তীর্থযাত্রীদের সেবার মধ্য দিয়ে তিনি জীবনের প্রকৃত সুখের সন্ধান পেয়েছেন। নিষ্কাম কর্মে বিশ্বাসী বিশ্বাস মশাই দেবাত্মা হিমালয়ের থেকে তাঁর হৃদয় ও মনকে বিশাল, উদার ও বৈরাগ্যময় করে তুলেছেন। এভাবেই এক সাধারণ নামহীন বিশ্বাস মশাই লেখকের সাবলীল বর্ণনায় এক জীবন্ত চরিত্র হয়ে উঠেছে।

গল্পের শেষাংশে দেখি হরিদ্বার থেকে গল্পের বক্তাদের যাবার সময় বিশ্বাস মশাই এসেছিলেন তাঁদের ট্রেনে তুলে দেবার জন্য। তখন অনেক রাত হয়েছিল। তিনি নিজের হাতে সকলের জিনিসগুলি গুছিয়ে দিয়ে বিদানাপত্র পেতে দেন। তারপর রাত্রের খাবার আলদা করে বেঁধে, কুঁজোতে জল ভরে দিলেন। এরপর প্ল্যাটফর্মে নেমে ম্লান মুখে দাঁড়িয়ে রইলেন। ট্রেন দাঁড়ালে বক্তা তাঁকে ডেকে দশ টাকার একটি নোট তাঁর হাতে দেন। টাকাটি হাতে নিয়ে বিশ্বাস মশাই অসহায় ভাবে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখ বিবর্ণ, হাতটা কাঁপছে। বিশ্বাস মশাই চরিত্রের এই ব্যথাদীর্ন ও সকরুণ দিকটি গল্প শেষে একটা মর্মস্পর্শী আবহের সৃষ্টি করেছে। অর্থাৎ বিশ্বাস মশাই মাত্র একদিনেই তাঁর স্বভাব বৈশিষ্ট্য গল্পের বক্তা ও তাঁর পুরো পরিবারকে একেবারে নিজের করে নিয়েছিলেন। যার জন্য তাঁদের কাছ থেকে তাঁর কোনও চাহিদা দিল না। তিনি একেবারে পরিবারের আপনজনটির মতোই প্রাণপনে তাঁদের যত্নআত্তি ও সেবা করেছেন। কিন্তু গল্পের বক্তা যখন তাঁর হাতে অর্থ তুলে দেন, তখন তাঁর অন্তরের যোগসূত্র সেখানে ছিন্ন হয়। তিনি তাঁদের একান্ত আপন করে নিলেও তাঁরা তাঁকে আপন করতে পারেননি। বিশ্বাস মশাই অনুভব করেন তাঁদের কাছে তিনি এক পরিচারক হিসেবেই থেকেছেন; এর অতিরিক্ত কিছু নয়। এই ভেবে তিনি বিষাদে ডেঙে পড়েন। গল্পকার বিশ্বাস মশাই চরিত্রের এই ব্যথা ভরা দিকটিকে গল্প শেষে উন্মোচন করে, গল্পটিকে পাঠক মহলে শাশ্বত করেছেন।



আসুন জেনে নিই ... শব্দার্থ

বায়নাক্কা ঃ আবদার, কোনও কিছুর জন্য অবিরত দাবি বা প্রার্থনা।

ম্লেচ্ছাচার ঃ ম্লেচ্ছের মতো আচরণ অর্থাৎ হিন্দু ধর্মমতে অশুদ্ধ আচার।

অবিন্যস্ত ঃ এলোমেলো, অগোছালো।

কুঁজো ঃ জল রাখার এক ধরনের সরু গলার কলস।

প্রবৃত্ত ঃ নিযুক্ত, রত।

দ্বিধা ঃ সংশয়, সন্দেহ।

কুণ্ঠিত ঃ লজ্জিত, সংকুচিত।

মর্যাদা ঃ গৌরব, গরিমা, সন্মান।

বিবর্ণ ঃ নিষ্প্রভ, ফ্যাকাসে।

কুঞ্চিত ঃ কুঁচকে যাওয়া।

তন্বী ঃ ছিপছিপে গড়নের মেয়ে, কৃশ অথচ সৌষ্ঠবপূর্ণ দেহ যার এমন স্ত্রীলোক।

অন্তরায় ঃ বাধা, প্রতিবন্ধক, বিঘ্ন।

অকাট্য ঃ খণ্ডন অর্থাৎ অপ্রমাণ করা যায় না, কাটবার অযোগ্য, যথার্থ।



অগ্রগতি নির্ধারক প্রশ্ন

প্রশ্ন নং ১ ঃ গল্প কথক কী দেখবেন বলে ঘুরতে বেরিয়েছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ২ ঃ আগ্রার বাঙালি বন্ধুরা গল্প কথককে কী অনুরোধ করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৩ ঃ গল্প কথক হরিদ্বারে কার ভরসায় গিয়েছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৪ ঃ গল্প কথক কখন হরিদ্বারে পৌঁছেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৫ ঃ গল্প কথকের মতে বিদেশে কারা বন্ধু?

.....

প্রশ্ন নং ৬ ঃ ষ্টেশনে গল্প কথক কার কাছে বিশ্বাস মশাই এর ঠিকানা জিজ্ঞাসা করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৭ ঃ বিশ্বাস মশাই এর পোষাক কেমন ছিল?

.....

প্রশ্ন নং ৮ ঃ বিশ্বাস মশাই গল্প কথককে কোন পাণ্ডার বাড়ি নিয়ে গেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ৯ ঃ বিশ্বাস মশাই কুলিপিছু কত পয়সা (আনা) দিয়েছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১০ ঃ হরিদ্বারে গল্প কথকের গিন্নী কী রান্না করেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১১ ঃ গল্প কথক বিশ্বাস মশাইকে বাজার করার জন্য কত টাকা দিয়েছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১২ ঃ হরিদ্বারে কত রকম নস্যি পাওয়া যায় ও কী কী?

.....

প্রশ্ন নং ১৩ ঃ গল্পকথক ছেলের জ্বর কমার জন্য কী ওষুধ আনতে বলেছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৪ ঃ গল্প কথক হরিদ্বার থেকে বাসে কোথায় ঘুরতে গিয়েছিলেন?

.....

প্রশ্ন নং ১৫ ঃ বিশ্বাস মশাই এর দাদার নাম কী?

.....

প্রশ্ন নং ১৬ ঃ গল্প কথক হরিদ্বার থেকে যাবার সময় বিশ্বাস মশাইকে কত টাকা দিয়েছিলেন?

.....



৮.৪ অধ্যায় সংক্ষেপ

- 'বিশ্বাস মশাই' গল্পটিতে বনফুলের আত্মজৈবনিক অভিজ্ঞতার ছাপ আছে।
- ভারতবর্ষ ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দেশ। এই আদর্শ অতি নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করেছেন বিশ্বাস মশাই।
- 'বিশ্বাস মশাই' গল্পে লেখকের ভ্রমণ পিপাসু মনের ছাপ রয়েছে।



৮.৫ অতিরিক্ত পঠন

১) ভট্টাচার্য, জগদীশ; *বনফুলের শ্রেষ্ঠ গল্প।*

২) ভট্টাচার্য, দীপান্বিতা; *বোধে ও বীক্ষণে।*

৩) মিত্র, সরোজমোহন; *বনফুলের ছোটগল্প।*



৮.৬ অগ্রগতি নির্ধারক উত্তর

১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ আগ্রার তাজমহল।

২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ হরিদ্বার দেখার।

৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ বিশ্বাস মশাই।

৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ ভোরে।

৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কুলিরা।

৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কুলির কাছে।

৭ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পরনে আধময়লা জামাকাপড়, পায়ে শতছিন্ন ময়লা কেডস।

৮ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কুম্ভকর্ণ পাণ্ডা।

৯ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ দু-আনা।

১০ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ খিচুড়ি ও আলুর ছেঁচকি।

১১ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ পাঁচ টাকা।

১২ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ দুই রকম। মাদ্রাজী ও পরিমল।

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কুইনিন ট্যাবলেট।

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ হৃষীকেশ ও লছমনঝোলা।

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ কর্নেল সুরেশ বিশ্বাস।

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর ঃ দশ টাকা।